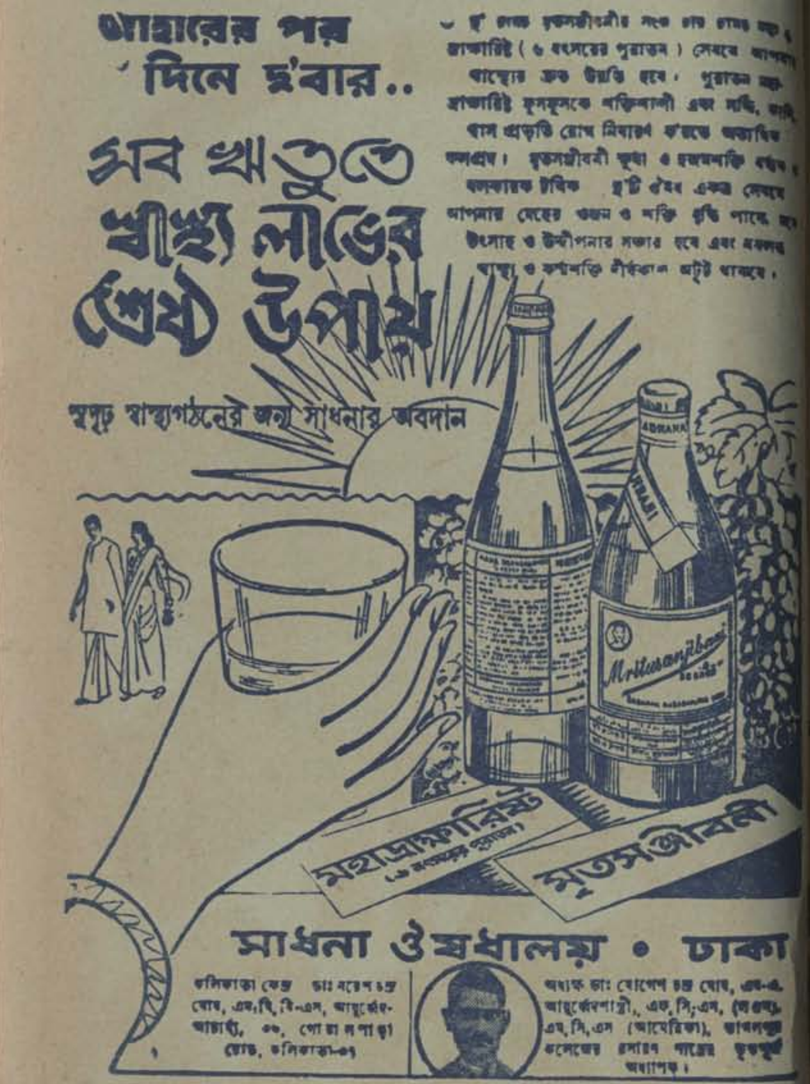

আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুস্থ স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা


পরিচয়

পরিচয়

শেকসপীয়র সংখ্যা

সম্ভাব্য লেখক-তালিকা

নীরেন্দ্রনাথ রায়
বিষ্ণু দে
অমলেন্দু বসু
অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী
সীতাংশু মৈত্র
হুমফ্রে হাউস
রাম বসু
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
শঙ্খ ঘোষ
মণীন্দ্র রায়
তরুণ সান্যাল
সুধাংশু ঘোষ
রুদ্র সেনগুপ্ত

প্রভৃতি

মহাকবি শেকসপীয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী বৈশাখ সংখ্যা পরিচয় বর্ধিতাকারে বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে।

বাংলা দেশের বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ এই সংখ্যায় শেকসপীয়রের কবিকর্মের সম্যক পর্যালোচনা করবেন ও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

*

এজেন্টদের কাছে অনুরোধ তারা যেন পূর্বাহ্নে তাদের চাহিদা জানান

সম্ভাব্য লেখক-তা

হিরণকুমার সান্যা
ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
সরোজ আচার্য
গোপাল হালদার
সুনীল চট্টোপাধ্যা
নারায়ণ গঙ্গোপা
জগন্নাথ চক্রবর্তী
অলোকরঞ্জন দা
প্রমোদ মুখোপাধ
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বিশ্বনাথ চট্টোপা
অজিত বন্দ্যোপা
অন্নদাশঙ্কর রায়

প্র

দাম : দেড় টাকা

এই সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা নিয়মিত পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়।

চাঁদার হার

বার্ষিক : দশ টাকা   ষান্মাসিক : সাড়ে পাঁচ টাকা

পরিচয়

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলিকাতা-৭

৪। প্রকাশক— " " " "

৫। সম্পাদকদ্বয়—(ক) গোপাল হালদার ; ভারতীয়
(খ) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; ভারতীয়
২৬।৩ হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্লাট নং ১৯ ; ব্লক "এইচ", সি. আই. টি. বিল্ডিংস্, ক্রিস্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩।এল, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮ একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ ॥ - । সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩ সার্কাস এভিনিউ, কলিকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলিকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩ ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমনি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩ লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪৬।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২ বি সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা- ৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, ৯৭ বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ৭ ডোভার লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট,

কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬ নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী। ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪ রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন) কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩ গরচা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-১৯ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২ পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ৩২। হিমাদ্রি-শেখর বসু, ১১ অমিতা ঘোষ রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪৭ ॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, ৩ যাদবপুর সাউথ রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯ শরৎ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-২৯। ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, গ্রেহামস্ লেন, কলিকাতা-৪০ ॥

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য। (স্বাঃ) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

পরিচয়

বর্ষ ৩৩। সংখ্যা ৮
মাঘ, ১৩৭০

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



শ্যামল চক্রবর্তী

শিক্ষা ও গণতন্ত্র

প্রচার বস্তুটা গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ—তা সে নিজের, দলের, বা সরকারের, যারই হোক না কেন। কারণ শেষ পর্যন্ত ভোটের ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে; এবং ভোটে জিততে হলে হেঁকে জানাতেই হবে যে আপনি বা আপনারা কি ভাবছেন, কি করেছেন, বা কি করতে চাইছেন। কাজেই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে জানাতেই হবে দেশের মানুষকে যে সে সরকারী ক্ষমতাকে কি উদ্দেশ্যে এবং কি ভাবে ব্যবহার করেছে।

আবার রাষ্ট্রীয় চিন্তার দিক থেকে, জনসাধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতার যে তত্ত্ব গণতন্ত্রের মূলে নিহিত রয়েছে, তাতে সরকারকে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বীয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করে যেতে হবে। এ দায়িত্ব সরকার পালন করেন সর্বপ্রকার প্রচারযন্ত্র মারফৎ, বিশেষ করে সুচিন্তিত, সুগ্রথিত প্রকাশনার মারফৎ।

কিন্তু গণতন্ত্র মানে সরকারের তরফ থেকে গণদেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশনা ও প্রচারের ফুল-বিল্বপত্র নিয়মিত নিবেদন নিশ্চয়ই নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে 'জনগণের সরকার'—এইরূপ যদি গণতন্ত্রকে প্রকৃতই নিতে হয়, তাহলে সরকার সম্পর্কীয় প্রতিটি বিষয়েই জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও বিচারপুষ্ট, সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত অভিমতের গভীর প্রভাব পড়তে হবে। এটা শুধু অধিকার নয়, অবশ্য পালনীয় দায়িত্বও বটে। আবার অন্য দিক থেকে এটা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। অর্থাৎ, সরকার তথ্য, তত্ত্ব ও মতামত সাধারণ্যে পরিবেশন করবেন এবং জনসাধারণ তার ওপর বিচার করবেন। সরকার যদি তাঁর কাজ না করেন, তবে জনমত সুশিক্ষিত ও সুচিন্তিত হওয়া দুষ্কর ; হবে তথ্য-বঞ্চিত ক্ষোভ ও খণ্ড-অভিজ্ঞতা-প্রসূত অনুভূতি ও আবেগ-মিশ্রিত ধারণা। আর সাধারণ মানুষ যদি সরকার-পরিবেশিত তথ্য চিন্তন ও বিশ্লেষণে নিস্পৃহ

থাকেন, তাহলে তা নিতান্তই গ্রীষ্মের আকাশ-কালো-করা ধূলিঝড়ের মতো
শুষ্ক প্রচারে পর্যবসিত হবে।

স্থতরাং ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রিদপ্তর ‘ভারতে শিক্ষণ-সমীক্ষা
(Review of Education in India) প্রকাশ করে একটি সৎ কা
করেছেন। বইটিকে তাঁরা বলেছেন শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম বর্ষপঞ্জী (First Yea
Book of Education)। এর বিচারকাল ১৯৪৭ থেকে ১৯৬১। বইটি
প্রকাশিত হয়েছে অগাস্ট, ১৯৬১। ঘটনা ইতিমধ্যে আরও এগিয়ে গেলেও
স্বাধীনতার পর প্রথম দশ-এগারো বছরের খবর যথেষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা কর
হয়েছে। বলতে গেলে, প্রথম তুটো পরিকল্পনার প্রায় শেষ পর্যন্ত খবর
বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তর এই দশকে যখন স্বাধীন ভারতের শিক্ষাদ
নির্ধারিত হচ্ছে, যখন নানারকমের নতুন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে, নানা পরীক্ষা
নিরীক্ষা চলেছে, তখন এই দশকের শিক্ষার ইতিবৃত্ত নিঃসন্দেহে অসাধা
গুরুত্বপূর্ণ। তার ওপরেও অবশ্য এ বইয়ে আছে তৃতীয় পরিকল্পনার ঈপ্সি
লক্ষ্যগুলি। সম্প্রতি ভারতীয় ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বাস্তব রূপা
নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলেছে। হয়তো বা সেই পটভূমিকাতেই ভার
সরকার পনেরো বছরের দূরায়ত-লক্ষ্য পরিকল্পনা বা Perspective Plannin
এর জন্য কমিটি নিয়োগ করেছেন। স্থতরাং এই সময়ে স্বাধীনতার পর
প্রথম যুগের চিন্তা ও ঘটনার পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলেই ম
করি।

বইখানি বৃহদাকৃতি। তথ্য ও পরিসংখ্যান মিলিয়ে লেখা হাজার পৃ
বেশি। ১৯টি পরিচ্ছেদ ও ৮টি সংযোজনী আছে। দেড়শো পৃষ্ঠা ধরে আ
‘শিক্ষা-দপ্তর’ ও ‘বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দপ্তরে’র নি
সংগঠন ও কার্যক্রমের বিবরণী। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে ১৫টি রা
সরকারের স্বতন্ত্র বিবরণ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিস্তৃত বর্ণনা; উপ
সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি সার্বিক পর্যালোচনা। আলোচ্য বিষয়ের পরি
বিশালতা অনুমান করা যাবে নিম্নলিখিত কতগুলি মোটা দাগের বিষয়-সূ
দিকে দৃষ্টি রাখলে: যেমন, ঐতিহাসিক পটভূমি, সংগঠন ও কার্য
প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, স্ত্রী-শি
ছাত্র-বৃত্তি, সামাজিক শিক্ষা, শরীরচর্চা ও সহযোগী শিক্ষা, হিন্দি-প্র
প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা, অন্ধ, মূক, বধির, অপরিণত বুদ্ধি প্রভৃতি অ

অক্ষমদের শিক্ষা, শিক্ষা-গবেষণা, অন্যান্য কার্যসূচী, শিল্প-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানে ছাত্রবৃত্তি, স্বাধীনতার পরে ভারতে সংস্কৃতির প্রসার, বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, ইত্যাদি। স্বভাবতঃই এত বিভিন্নমুখী কার্যাবলী সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আগ্রহী পাঠকের জিজ্ঞাসার উপাদান যে এতে মিলবে সেটুকু জানাবার জন্যেই বিষয়গুলির উল্লেখ করলাম। কতকগুলি সাধারণ ঘটনা ও সমস্যার উল্লেখ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আশা করব, যোগ্যতর ব্যক্তি বারান্তরে এ আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

সরকারী কার্যক্রমের প্রসার

প্রথম দৃষ্টিতে যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হচ্ছে, আলোচ্য সময়ের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে কার্যক্রম বেড়েছে প্রচুর, আগের তুলনায় ব্যয় বেড়েছে অনেক, নতুন চিন্তার ভিত্তিতে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার চেষ্টা হয়েছে, শিক্ষা-প্রাপ্তের সংখ্যাও বেড়েছে। ভারতের সংবিধান ‘শিক্ষার’ মূল দায়িত্ব রেখেছে রাজ্য সরকারের হাতে; কিন্তু বিভিন্ন ধারা-উপধারার মারফতে কেন্দ্রীয় সরকারের এ সম্পর্কে মোট দায়িত্বও কম নয়। স্থতরাং কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব বিশেষ দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে চিন্তাগত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা বজায় রাখবার জন্যে ‘Clearing House’-এর কাজ চালিয়ে চলেছে, এবং সারা দেশে শিক্ষাদানে সম-মান আনবার জন্যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বা দুর্বলকে যথাযথ সাহায্য করবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে। এ কাজের জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর ৯টি ‘বিভাগে’ সংগঠিত হয়েছে; বেশ কিছু সংখ্যক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছে; ‘বোর্ড’, ‘কাউন্সিল’, প্রভৃতি নামে ১৫টি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সংগঠন গঠিত হয়েছে’; কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর ৪টি বার্ষিক ‘রিপোর্ট’ ও ৪টি ত্রৈমাসিক শিক্ষা সম্পর্কীয় পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছে।[২] ভারত সরকার ১৯৪৮-৪৯ সালে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে ‘বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন’ ও ১৯৫২ সালে ডঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে ‘মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন’ নিয়োগ করেন। এই দুই মূল্যবান রিপোর্টের ভিত্তিতেই সারা ভারত জুড়ে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজা হয়েছে। মহাত্মাজির চিন্তা অনুসরণ করে ‘বুনিয়াদি শিক্ষা’কে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষার বিস্তার : প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র সংখ্যায়

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯; এখন ... দাঁড়িয়েছে ৪৬-এ।[৩]

'বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা কাউন্সিলের' (Council ... Scientific and Industrial Research) তত্ত্বাবধানে ২৬টি জাতীয় গবে... পরীক্ষাগার (National Research Laboratories) স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়াও, 'জাতীয় অধ্যাপকে'র পদ সৃষ্টি, 'বিজ্ঞান মন্দির' পরিকল্পনার প্রচল... Central Geophysics Board ও National Atlas Organisation স্থাপ... Survey of India, Botanical Survey of India, Zoological Surve... of India, Department of Anthropology-র প্রসার প্রভৃতি, বিজ্ঞান ... শিল্প-বিজ্ঞানের বিকাশের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘটেছে এই সময়ে।

কলেজীয় শিক্ষার দিকে তাকালেও অগ্রগতি চোখে পড়বে। ১৯৪৬-... সালে কলা ও বিজ্ঞান কলেজের সংখ্যা ছিল ২৯৭, ইণ্টারমিডিয়ে... কলেজ ছিল ১৯৯টি, এবং বৃত্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কীয় কলেজ ছি... ১৪০টি। তার পরের ১৪ বছরে, অর্থাৎ, ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ... বিভাগের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৬২, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত (Constituent ... কলেজের সংখ্যা ২২৮, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (affiliated) কলেজের সংখ্যা ১৩... ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ৯৮৮ ও বৃত্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কীয় কলেজে... সংখ্যা (১৯৫৮-৫৯ সালে) ৭০৬। ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাবে নীচে... তালিকা থেকে :

তালিকা—ক

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ছাত্র সংখ্যা (লক্ষে)

বর্ষ	কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	বৃত্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার কলেজ	বিশেষ শিক্ষার কলেজ	মোট ছা... ভর্তি
১৯৪৬-৪৭	২·১২	০·৪৪	...	[illegible]
১৯৪৯-৫০	২·৯৯	০·৭৯	০·০৫	[illegible]
১৯৫৮-৫৯	৭·৩৪	২·০২	০·২১	[illegible]
১৯৬০-৬১ (আনু. হিসাব)	৮·৪০	২·৫০	০·২৫	[illegible]
১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	১২·২০	৪·২০	০·৪০	[illegible]

মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রসার যে ঘটেছে সে চিত্র নীচের তালিকাটিতে ফুটে উঠেছে।

তালিকা—খ

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার

মাধ্যমিক	১৯৪৯-৫০	১৯৫৮-৫৯	১৯৬০-৬১ (আনুমানিক হিসাব)	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)
বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৬,৬৮২	১৪,৩৩৪	১৫,৬০০	২২,৬০০
ছাত্র-ভর্তি সংখ্যা (লক্ষে)	১০·৮৩	২৭·৭৮	২৯·১	৪৫·৪

এবার প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার হিসেবটা নেওয়া যাক। ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রাথমিক ও মধ্যবিদ্যালয়ের (Middle Schools) সংখ্যা ছিল ১,৭২,৬৬১ এবং ১২,৮৪৩, ১৯৬০-৬১ সালে উভয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩,৪২,০০০ এবং ৩৯,৬০০। ছাত্র-ভর্তি সংখ্যার তালিকা নীচে দেওয়া হল :

তালিকা—গ

প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-সংখ্যা (লক্ষে)

বৎসর	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী	৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণী
১৯৪৬-৪৭	১৪১·১	২০·৪
১৯৪৯-৫০	১৮১·৯	২৮·৪৩
১৯৫০-৫১	১৯১·৫	৩১·২
১৯৫৫-৫৬	২৫১·৭	৪২·৯
১৯৫৮-৫৯	৩০৭·২	৫৪·৬৬
১৯৬০-৬১ (আনুমানিক হিসাব)	৩৪৩·৪	৬২·৯
১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৪৯৬·৪	৯৭·৫

অনুরূপভাবে বৃত্তি বিষয়ক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রসার ঘটেছে। ১৯৪৯-৫০ সালে এই ধরনের বিদ্যালয়ের ও ছাত্র-ভর্তির সংখ্যা যেখানে ছিল ৬,১২৮ ও ২,৯৪,৪০৭, সেক্ষেত্রে ১৯৫৮-৫৯ সালে উভয়েরই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭,৫১০ ও ৫,০৮,২১৪তে।

এক কথায় বলতে গেলে ভারতবর্ষে এই ১৪ বছরে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে

সংখ্যায় ও বহুমুখী প্রবাহে। গড়ের হিসাবে দাঁড়ায় ১৯৪৯-৫০ সালের তুল
১৯৫৮-৫৯ সালে ছাত্র-ভর্তি সংখ্যা বেড়েছে নিম্নলিখিত শতক হারে :

তালিকা—ঘ

১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে ছাত্রবৃদ্ধির শতকরা হার

শিক্ষার মান	শতকরা বৃদ্ধি
১। কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	১৪৫
২। বৃত্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার কলেজ	১৫৬
৩। বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৩২০
৪। মোট কলেজী ছাত্র	১৫০
৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫৬
৬। প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ম-৫ম শ্রেণী)	৬৯
৭। মধ্য বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণী)	৯২
৮। বৃত্তি বিষয়ক বিদ্যালয়	৭৩

'তালিকা ঘ' থেকে সহজেই দেখা যায় যে শতকরা হার সব থেকে বে
বিশেষ শিক্ষার কলেজী ছাত্রের মধ্যে এবং সবচেয়ে কম ১ম থেকে ৫ম শ্রে
পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ভর্তির মধ্যে। অবশ্য এটাতে প্রমাণ কি
হয় না; আসলে বিশেষ শিক্ষার কলেজে ছাত্র বেড়েছে ৫ হাজার থে
২১ হাজার পর্যন্ত, এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেড়েছে ১ কোটি ৮১ ল
থেকে ৩ কোটি ৭ লক্ষে।

শিক্ষাখাতে ব্যয়

এরই সাথে মিলিয়ে একবার ব্যয়ের হিসাবটা দেখা যাক :

তালিকা—ঙ

বিভিন্ন উৎস থেকে শিক্ষার জন্য মোট ব্যয়

বৎসর	সরকারী তহবিল	জিলা-বোর্ড তহবিল	মিউনিসিপ্যাল তহবিল	ছাত্রদের মাহিনা	অন্যান্য	মো
১৯৪৬-৪৭ কো. টা.	২৫'৯৫	৫'১৮	৩'২১	১৫'২২	৮'০৭	৫৭'
মোটের শতক হার	৪৫'৩%	৮'৭%	৫'৮%	২৫'৬%	১৪'৬%	১০০
১৯৪৯-৫০ কো. টা.	৫৭'০১	৭'৪২	৪'৫২	২০'৬৬	১২'১১	১০২'
মোটের শতক হার	৫৬'৩%	৭'৩%	৪'৪%	২০'২%	১১'৮%	১০০
১৯৫৮-৫৯ কো. টা.	১৭৭'১৫	৮'৫৩	৭'৯৬	৪৮'৪৩	২৩'৬১	২৬৬'
মোটের শতক হার	৬৬'৭%	৩'২%	৩'০%	১৮'২%	৮'৯%	১০০

এতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার জন্য সামগ্রিক ব্যয় অনেক বেড়েছে, সরকারী ব্যয়ও বেড়েছে ১৯৪৯-৫০ সালে ৫৭ কোটি টাকা থেকে ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৭৭ কোটি টাকায়। অর্থাৎ, সরকারী বার্ষিক ব্যয় তুলনায় প্রায় ১২০ কোটি টাকা বা শতকরা ২০৮% বেড়েছে। সেই তুলনায় মোট ব্যয় বেড়েছে প্রায় ১৬৩ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬০%, এবং ছাত্রদের মাহিনার অংশ সাড়ে এগারো কোটি টাকা বা প্রায় ৯৫%।

এবার বিশেষ কতকগুলি খাতে ব্যয়ের তারতম্য কি হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করলে আর্থিক দায়িত্বের চিত্রটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তালিকা চ

শিক্ষার জন্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ও মোট ব্যয়ের অনুপাত বিভাগ

শিক্ষা	বৎসর	মোট ব্যয়	সরকারের অংশ %	জিলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি অংশ %	ছাত্রদের মাহিনার অংশ %	অন্যান্য অংশ %
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪৯-৫০	৩৩,৯৫'৯৫	৬৬'৯	২৬'২	২'৪	৪'৫
	১৯৫৮-৫৯	৬৩,৬৩'৫৫	৮১'৪	১৩'২	৩'৪	২'০
মধ্য বিদ্যালয়	১৯৪৯-৫০	৬,১৭'৬৫	৪৮'৬	১৪'৫	২৪'৩	১২'৬
	১৯৫৮-৫৯	৩১,৮২'০২	৭১'৪	১২'২	৯'৭	৬'৭
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৪৯-৫০	২০,৪৬'৩৩	৩১'৬	৩'১	৫০'৩	১২'০
	১৯৫৮-৫৯	৫০,৪৯'৮৭	৪৫'৯	৩'৮	৪১'১	৯'২
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ (সাধারণ শিক্ষা)	১৯৪৯-৫০	৬,৫২'৩৯	৩৮'১	০'৩	৪৯'৯	১১'৭
	১৯৫৭-৫৮	১৪,১১'৫৭	৩৪'৯	০'১	৫৩'০	১২'০
	১৯৫৮-৫৯	১৫,৮০'৪১	(পাওয়া যায় না)			
কৃষিবিজ্ঞান কলেজ	১৯৪৯-৫০	৩৩'৮৯	৬৮'৮	...	১২'২	১৯'০
	১৯৫৮-৫৯	৯৫'৩৮	৭০'৫	...	১১'৩	১২'৩

শিক্ষা	বৎসর	মোট ব্যয়	সরকারের অংশ %	জিলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি অংশ %	ছাত্রদের মাহিনার অংশ %	অন্যান্য অংশ %
বাণিজ্যবিষয়ক কলেজ	১৯৪৯-৫০	১৮'২৮	১৮'৬	...	৭০'০	১১'৪
	১৯৫৮-৫৯	৪৬'১৮	১৬'২	...	৭৫'৫	৮'৩
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১৯৪৯-৫০	৭৫'৬৯	৭২'০	...	২০'৬	৭'৪
	১৯৫৮-৫৯	২৯৯'২৫	৬৪'৭	...	২৬'৫	৮'৮
আইনবিষয়ক কলেজ	১৯৪৯-৫০	১০'২১	৮'০	...	৮৪'৩	৭'৭
	১৯৫৮-৫৯	২২'৬১	৫'০	...	৯১'৪	৩'৬
চিকিৎসাবিজ্ঞান কলেজ	১৯৪৯-৫০	১২৯'৮৯	৬৯'৫	৩'০	২২'৫	৫'০
	১৯৫৮-৫৯	৪৩৯'৫২	৭৩'১	১'৯	১৬'০	৯'০
শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ	১৯৪৯-৫০	৩৩'৫৫	৮২'৯	...	৮'৯	৮'২
	১৯৫৮-৫৯	১১৯'৩৪	৭৬'০	...	১৪'৭	৯'৩
প্রযুক্তিবিজ্ঞান কলেজ	১৯৪৯-৫০	১৬'৩৫	৮৮'৭	...	৭'১	৪'২
	১৯৫৮-৫৯	১৬'৫৭	৬২'৮	...	১১'৫	২৫'৭
প্রযুক্তিবিজ্ঞান স্কুল	১৯৪৯-৫০	৩৪৩'০২	৭৭'১	১'৯	৯'৯	১১'১
	১৯৫৮-৫৯	৮২১'৮৪	৭৬'৭	১'১	১৩'৮	৮'৪
কৃষিবিজ্ঞান স্কুল	১৯৪৯-৫০	১০'৮৯	৯৩'৮	০'১	১'০	৫'১
	১৯৫৮-৫৯	৩৬'২২	৮৪'০	...	১'০	১৫'০
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	১৯৪৯-৫০	২০'৮৩	৮০'০	১'০	১৩'৭	৫'৩
	১৯৫৮-৫৯	১৪২'২৭	৭২'০	০'৫	২৪'০	৩'৫
প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্প-বিজ্ঞান স্কুল	১৯৪৯-৫০	১০৯'৪৩	৭০'৩	৪'০	৮'৯	১৬'৮
	১৯৫৮-৫৯	২৭২'২১	৮০'০	১'৭	৮'৭	৯'৬
শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুল	১৯৪৯-৫০	১৬০'৬৩	৮৮'৭	০'৩	৪'৪	৬'৬
	১৯৫৮-৫৯	২৫৫'৭৮	৮৭'৬	০'৩	৪'৭	৭'৪

তালিকা মস্ত বড়ো হয়ে গেল, যদিও অনেক ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের

হিসাব এতে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবু এই পরিসংখ্যান কতকগুলি জরুরি দিকে আলোকপাত করছে।

প্রথমেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা ধরা যেতে পারে। এই ন বছরের মধ্যে বার্ষিক ব্যয় প্রায় ৩০ কোটি টাকা বেড়ে গেছে; এবং সরকার আগে যেখানে মোট খরচের দুই-তৃতীয়াংশ বহন করতেন, পরে তা পাঁচ ভাগের চার ভাগে দাঁড়িয়েছে। তবু এখনও খরচের শতকরা সাড়ে তিন ভাগ ছাত্রদের মাইনে থেকেই আসছে। সম্পূর্ণ বিনা-মাইনে করা যায় নি; বরং সামান্য কিছু, অর্থাৎ শতকে এক ভাগ বেড়েছে। মধ্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, দেখা যাচ্ছে, সরকারের দায়িত্ব বেড়েছে, অন্যদের কমেছে। কিন্তু এখনও প্রায় শতকে ১০ ভাগ অর্থ আসছে ছাত্রদের মাইনে থেকে। উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অবস্থা বেশ পালটাল। এখানে ছাত্রদের ভার আগের তুলনায় কমলেও, এখনও মোট খরচের শতকরা ৪৬ ভাগ সরকার এবং ৪১ ভাগ ছাত্ররা বহন করে। সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষার ব্যয় দু-গুণের বেশি বাড়লেও, সরকারের দায়িত্বের হার অনুপাতে শতকরা তিন ভাগ কমেছে ও ছাত্রদেরও বেড়েছে ঠিক সেই অনুপাতেই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলির ব্যয়ের অনুপাতের দিকে নজর করলে বোঝা যাবে যে সরকার বাণিজ্য ও আইন-বিষয়ক শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যয় করছেন না। এ দুটি ক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যয়ের ভার ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়ে সামলানো যাচ্ছে। কৃষি শিল্পবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির মূল দায়িত্ব সরকারই বহন করছেন।

সমগ্রের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা

এবারে হিসেবটা অন্য দিক থেকে করা যাক। কতো ছিল আর এখন কতো বেড়েছে শুধু সেটুকু দেখাই যথেষ্ট নয়; কতো বাড়ার আশা বা প্রয়োজন ছিল সেই দিকটাও দেখা দরকার।

চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়ের বিনাখরচে বাধ্যতামূলক শিক্ষার দাবি ভারতবর্ষে উঠেছে আজ প্রায় একশো বছরেরও আগে থেকে। ব্রিটিশ-রাজ স্বভাবতঃই কোনোদিনই সে দাবি স্বীকার করে নি। ১৯৪৪ সালে 'যুদ্ধোত্তর যুগে শিক্ষাবিকাশের পরিকল্পনা'য় ধরা হয়েছিল যে এ লক্ষ্যে পৌছতে ৪০ বছর লাগবে। স্বাধীনতার পরে 'খের কমিটি' অভিমত জানিয়েছিলেন যে

১৬ বছরের মধ্যে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা সম্ভব। ভারতের সংবিধান বিষয় ওপর আরও গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশ দিল যে আরও কম সময়, অর্থাৎ বছরের মধ্যে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরাধীনতামুক্ত কোটি কো ভারতবাসীর আকাঙ্খাকে ভাষায় রূপ দিয়ে সংবিধানে যা ঘোষিত হয়েছি তার সঙ্গে বর্তমান অবস্থাকে মিলিয়ে দেখুন :

তালিকা ছ

বয়স	১৯৬০-৬১ (আনুমানিক হিসাব)			১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)		
	মোট %	ছেলে %	মেয়ে %	মোট %	ছেলে %	মে[illegible] %
১। ৬-১১ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা যে অংশ স্কুলে ভর্তি হতে পারছে (শ্রেণী ১ম-৫ম) …	৬১.১	৮০.১	৪০.৪	৭৬.৪	৯০.৪	[illegible]
২। ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা যে অংশ স্কুলে ভর্তি হতে পারছে (শ্রেণী ৬ষ্ঠ-৮ম) …	২২.৮	৩৪.৩	১০.৮	২৮.৬	৩৯.৯	[illegible]
৩। ১৪-১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা যে অংশ স্কুলে ভর্তি হতে পারছে (শ্রেণী ৯ম-১১শ) …	১১.৮	১৮.৪	৪.২	১৫.৬	২৩.৭	[illegible]

ওপরের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংবিধান গৃহীত হবার ১০ ব পরে ৬-১১ বছরের শতকরা ৬১ ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে ভর্তি হতে পারবে, ত মধ্যে ছেলেদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং মেয়েদের শতকরা ৪০ তাগ। এ কি আরও ৫ বছর, অর্থাৎ, তৃতীয় পরিকল্পনার পরেও এ অনুপাত, ছেলে শতকরা ৯০ ভাগ ও মেয়েদের শতকরা ৬১ ভাগের ওপরে ওঠবার সম্ভা নেই। অর্থাৎ সংবিধান গ্রহণোত্তর ১৫ বছর পরেও শতকরা প্রায় ২৫ ভা মানুষের স্কুলে এসে অক্ষর পরিচয় করা সম্ভব হবে না। মনে রাখবেন, এ বয়স তখন ৬ থেকে ১১ বছর। এদের জীবৎকাল আরও ৫০-৬০ বছর ধর অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালের পর আরও ৫০।৬০ বছর পর্যন্ত ঐ সময়কার বয় এক-চতুর্থাংশ মানুষের নিরক্ষরতার ভার সমাজের ওপর অনড়ভাবে চেপে থাকবে।

তার পরবর্তী অংশ, অর্থাৎ, ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। ১৯৬০-৬১ সালে এদের শতকরা ২২.৮ ভাগ স্কুলে পড়বে; আরও ৫ বছর পরে এই গড় গতকরা ৫.৮ ভাগ বেড়ে ২৮.৬ ভাগে দাঁড়াবে। অর্থাৎ সংবিধান গ্রহণের ১৫ বছর পরেও এই অংশের এক-তৃতীয়াংশকেও স্কুলে ভর্তি করা যাচ্ছে না। তাহলে ১৪ বছরের সব ছেলেমেয়েকে ৮ বছর স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কবে নাগাদ করা যাবে? এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ নির্বাক। বরঞ্চ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬-১১ বছরের ছেলেদের শতকরা ৯০ ভাগকে যে স্কুলে আনা যাবে এই আশাতেই কর্তৃপক্ষের কথায়-বার্তায় বেশ একটু আত্মপ্রসাদের ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বলছেন—মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাটা একটু পিছিয়ে রয়েছে, সেইদিকে মন দিতে পারলে বেশ কিছু এগুনো হবে।

এখানে প্রশ্ন আসে, সংবিধান ১৪ বছরের লক্ষ্য উপস্থিত করে কি ভুল করেছিল? ১১ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করলেই কি যথেষ্ট হবে?

ব্যাপারটা আসলে তা নয়। 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' স্কুল শিক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—প্রাথমিক (১ম-৫ম শ্রেণী), মধ্য (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী) ও উচ্চ মাধ্যমিক (৯ম-১১শ শ্রেণী)। তাঁদের মতে প্রাথমিক শিক্ষা ১ম-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হলেও, ৫ম শ্রেণীর পর থেকে শিক্ষার ধরন পালটাতে হবে; এবং, ৯ম-১১শ শ্রেণী পর্যন্ত যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, ছাত্রদের তার জন্য, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী, এই পর্যায়ের মধ্যেই প্রস্তুত করে নিতে হবে; প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রদের পক্ষে যাতে দুস্তর বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কিন্তু তার মানে একথা নয় যে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত ৫ম শ্রেণীর বিদ্যাই যথেষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে যার পরে কোনো ছাত্রকে চরে খেতে বলা যেতে পারে। পশ্চিম দুনিয়ার অগ্রগামী দেশগুলিতে পুরো মাধ্যমিক শিক্ষাই সকল নাগরিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আমাদের ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ। সুতরাং পূর্ণ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বাদ দিয়ে, ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার দাবি যে ন্যায্য, এটা নিশ্চয়। এটা নিশ্চয় এই কারণে যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ৮ বছরের শিক্ষাক্রম উত্তীর্ণ না হতে পারলে কারুকেই সংসারে প্রবেশ করার উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত এ কথা বলে চলে না। সংবিধানের মৌলিক অধিকারের

অধ্যায়ে ২৪ নং ধারায় বলা আছে ১৪ বছরের কম কোনো শিশুকে কোনো ফ্যাক্টরী বা খনিতে নিয়োগ করতে পারবে না। আইনে আছে, ১৪ বছরের কম বয়সের মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ, ১৪ বছর বয়স পার হলে আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা দেহে ও মনে সংসারে নিজের ঠাঁই করে নেবার সর্বনিম্ন যোগ্যতা অর্জন করছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং যারা ১৪ বছরের পর সংসারে ঢুকবে, তাদের সর্বনিম্ন প্রস্তুতি, এই ৮ বছরের স্কুল জীবন অপরিহার্য। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালের পরেও ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৭২ জন এই স্কুল-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে। অবশ্য প্রথম বয়সের দলের (৬-১১) সঙ্গে, দ্বিতীয় দলের (১১-১৪) সংখ্যার তারতম্য আছে, তবুও মোটামুটি ধরা যায় যে, ৬-১১ বছরের শতকরা ৪৫ ভাগ ছেলেমেয়ে, যারা প্রাথমিক স্কুলে পড়ছিল, তারা ১১ বছরের পরে পড়া ছেড়ে দিল। তখন ছেলেদের চাকরী বারণ, মেয়েদের বারণ বিয়ে। তারা কি করবে তিন বছর? বাপের সঙ্গে লাঙল কাঁধে নিয়ে মাঠে যাবে? শহরে এসে বয়স ভাঁড়িয়ে কারখানায় ঢুকবে? বাবুদের বাড়ি চাকরের কাজ করবে? না, কি, চায়ের দোকানের বেয়ারা? অথবা, তিন বছর ধরে শুধুই খেলে বেড়াবে, আর ভুলবে যা কিছু শিখেছিল?

সমস্যাটা গুরুতর। আমি অবশ্য ধরে নিচ্ছি যে, যে ছেলেমেয়েরা ১১ বছরের মধ্যে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করছে, তারা গরীব কৃষক-মজুরের ঘরের ছেলেমেয়ে; ধনী, মধ্যবিত্ত, ভালো-মাইনে-পাওয়া কারখানার শ্রমিকের ঘরের নয়, এমনকি ধনী চাষীর ঘরেরও নয়। কাজেই এদের বড়ো অংশ লাগবে চাষের কাজে। এখন আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনায় সবচেয়ে বড়ো বাধা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে কৃষির অনগ্রসরতা। সে বাধা যে শুধু বর্তমানে রয়েছে তাই নয়, ভবিষ্যতেও তা বিপদরূপে দেখা দেবে। কৃষির উন্নতির জন্য নিশ্চয়ই শতরকম ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একথা সকলেই মানবেন যে কৃষির উন্নতি হবে না, কৃষকের উন্নতি না হলে। অর্থাৎ, ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে প্রাথমিক পাঠক্রম তা সকলের জন্যে বাধ্যতামূলকভাবে চালু না করতে পারলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে অবশ্যই।

এতক্ষণ আলোচনা করেছিলাম এই ধরে নিয়ে যে ৬-১১ বছরের যে ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে, তারা বোধ হয় ৫ বছরের পুরো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

সাঙ্গ করছে। বাস্তব অবস্থা আরও ভয়াবহ। আলোচ্য বই-এর ৭৯৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে ভারতে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০০টি ছাত্রের মধ্যে মোটে ৩৫টিকে ৫ বছর পরে ৫ম শ্রেণীতে দেখা যায়। তার মানে শতকরা বাকি ৬৫টি হয় ক্লাসে 'ফেল' করে আটকে থাকছে, নয়তো পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে একটা মারাত্মক অপচয় ও বদ্ধাবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 'ফেল' করার মধ্যে রয়েছে সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয়; 'ছেড়ে দেওয়া'র অপব্যয় আরও বেশি। অর্থাৎ, এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে কেবল, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ এই পর্যায়ে ছাত্র যে বিশেষ কিছু শিখল না তা নয়, যেটুকু শিখল তাও সে অনিবার্যভাবেই ভুলবে। অবশ্য এ কারণে সরকারী মহলে একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে প্রাথমিক শিক্ষাকে আর এমনি বাড়ানো নয়; একে দৃঢ়ভিত্তিক ও সুসংবদ্ধ করতে হবে। তা যে করতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা করা যাবে না কেন? এঁরাই হিসেব করে বলেছেন যে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অপচয় কম। এক্ষেত্রে শতকরা যে ১০০টি ছাত্রছাত্রী ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়, তিন বছর পরে তাদের ৬০টিকে দেখা যায় ৮ম শ্রেণীতে। 'অপচয়' এখানেও যথেষ্ট; তবে আগের পর্যায়ের মতো নয়।

এই সূত্রে লক্ষ্য করা দরকার যে ১৪-১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা মোটে ১১·৮ ভাগ ১৯৬০-৬১ সালে এবং শতকরা ১৫·৬ ভাগ ১৯৬৫-৬৬ সালে স্কুলে ৯ম-১১শ শ্রেণীতে পড়তে পারছে। স্কুল-শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাকে একটা 'পিরামিড' হিসাবে কল্পনা করলে, দেখা যাবে এর ভিতটা যে পরিমাণে চওড়া তার তুলনায় কোমরটা হঠাৎ সরু হয়ে গিয়ে মাথাটা প্রায় ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। চিন্তার কথা, এই বইয়েই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা না করে আমাদের দেশে এই বয়সের শতকরা ৩০ জন পড়লেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। নইলে চাকরির ব্যাপারে বিপদ ঘটতে পারে। যদি এটা ধরেও নিই যে সকলকে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার অবস্থা ভারতের এখনও নয়, তাহলেও ফারাকটা কি এত বেশিই হতে হবে? চাকরির বিষয়টা স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাবে পরে। কিন্তু এই বিভেদের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল যে মারাত্মক রূপ নিচ্ছে তা ভুললে চলবে কেন?

এ কথা অনস্বীকার্য যে উচ্চ-শিক্ষা অর্জনের মধ্যে নিহিত রয়েছে নেতৃত্ব

দেবার ক্ষমতা—তা সে অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেই হোক আ
সামাজিক পরিবেশেই হোক। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালেও শতকরা ১৫ জ
মাত্র উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়তে পারছে; অর্থাৎ, আরও ১৫-২০-২৫ বছর প
মূলত এদেরই একটা অংশের ওপর দেশের সব দিকের নায়কতার ভার পড়বে
কিন্তু আমাদের দেশ তো গণতন্ত্রের দেশ, এবং আমরা সমাজতন্ত্র আন
বলে ঠিক করেছি। অথচ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু যে সম্পদের মোট
অংশ শতকরা ১০ জনের কুক্ষিগত হচ্ছে তাই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক
ক্ষেত্রেও নেতৃত্বভার দীর্ঘকালের জন্য শতকরা ১৫ জনের হাতে আটকে
থাকছে। গণতন্ত্র মানে—জনগণের সরকার; শতকরা ১৫ জনের নেতৃত্ব নয়।

ব্যাপারটা অন্যদিক থেকেও দেখুন। 'তালিকা চ'-তে আমরা দেখেছি
যে ১৯৫৮-৫৯ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের শতকরা ৪১ ভাগ
আসছে ছাত্রদের মাইনে থেকে, যেখানে তুলনায় মধ্য-বিদ্যালয়ে ও প্রাথমিক
বিদ্যালয়ে মোট খরচের ছাত্রদের অংশ হল যথাক্রমে শতকরা ৯·৭ ও ৩·৪
অর্থাৎ, ৯ম শ্রেণী থেকে পড়তে গেলে ছাত্রকে কিছুটা খরচ করতে হয়।
সুতরাং ছাত্রসংখ্যা এই পর্যায়ে এসে যে অনেক কমে গেল, তার কারণ
মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক পশ্চাৎপদতার ভার যতই হোক না কেন
ছেলেদের ক্ষেত্রে মূলত অর্থাভাব। অর্থাৎ, উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষায় শুধুমাত্র
শতকরা ১৫ জন আসছে, এটাই একমাত্র চিন্তার বিষয় নয়; আসছে তারা
যাদের বাপ-মা খরচ করতে পারেন। এ হল 'শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা'—Class
Education-এর নমুনা, যা সমাজে বিত্তবান শ্রেণীর প্রাধান্য কায়েম করে।
তাহলে ভাবতে হয় ভারতে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে
অর্থনৈতিক একচেটিয়া মালিকানাকে যেমন ভাঙতে হবে, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে
উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের একচেটিয়া অধিকারের পরিবর্তন প্রয়োজন।

অবশ্য এই পর্যায়েও ভিত্তিটা কিছুটা প্রসারিত হয়েছে। শুধু ছেলেদের
হিসেব নিলে দেখা যাবে যে ১৯৬৫-৬৬ সালে ছেলেদের শতকরা ২৬·৭ ভাগ
৯ম-১১শ শ্রেণীতে পড়ছে। কিন্তু অনুপাত এখনও কত সামান্য; সমগ্রের
এক-চতুর্থাংশ ছাড়িয়েছে মাত্র।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর মোট ফল কি দাঁড়াচ্ছে। কলা, বিজ্ঞান, শিল্প
বিজ্ঞান—সর্ববিধ ব্যাপারেই দেশের ব্যাপকতম অংশের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা
অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। বলবেন—'প্রতিভা'কে চেপে রাখা যায় না। কিন্তু

যে কজন ফুটে বেরিয়েছেন তাদের দেখেই তো এ কথা বলছেন। যারা বেরতে পারল না, তাদের হিসেব কখনও নেওয়া হয়েছে কি? আর, তাছাড়া অসামান্য দিগ্বিজয়ী প্রতিভার ভরসায় জাতি অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। অগণিত সাধারণ মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার ওপরেই জাতিকে নির্ভর করতে হয়। এবং, এই সাংস্কৃতিক পরিবেশই প্রতিভার বিকাশকে সাহায্য করে।

'হাই-স্কুল' থেকে 'হায়ার-সেকেণ্ডারি স্কুল'

সাধারণ কথা ছেড়ে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার ছুটি বিশেষ সমস্যার কথা তুলছি।

'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রস্তাব করেছিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা ১১ বছরের হবে এবং ৯ম শ্রেণী থেকে 'কলা বা মানবিক' (Humanities), 'বিজ্ঞান', 'বাণিজ্য', 'প্রযুক্তিবিজ্ঞান' প্রভৃতি বিভিন্নমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। আলোচ্য বইখানিতে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ, ১৯৬০-৬১ সালে, মোট ৩,১২১টি স্কুলকে 'হায়ার সেকেণ্ডারি' পর্যায়ে উন্নীত করা হবে, অর্থাৎ, এখানে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে। তার মানে মোট ১৫,৬০০ স্কুলের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র এই পর্যায়ে উন্নত হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে মোট ২২,৬০০ স্কুলের শতকরা ৫০ ভাগ স্কুলেই ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। তাহলে এই ৫ বছরে ৮ হাজারের ওপর স্কুলকে উন্নত করা হলেও, ১১,৩০০ স্কুল পেছিয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু পরিকল্পনার মাঝ-বরাবরের হিসাব-নিকাশে (Mid-term appraisal) দেখা যাচ্ছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে শতকরা ৩০ ভাগের বেশিকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নত করা সম্ভব হবে না। (স্টেট্‌স্‌ম্যান্—২৯৷১০৷৬৩) তাহলে 'মুদালিয়র কমিশন' যে সংস্কারের কথা বলছিলেন সেটা কতটা পেছিয়ে থাকছে, তা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বিভিন্নমুখী পাঠক্রমের সমস্যা

দ্বিতীয় সমস্যাটির কথা, দুঃখের বিষয়, বইটিতে একেবারেই আলোচিত হয় নি। 'মুদালিয়র কমিশন' যে বিভিন্নমুখী শিক্ষার কথা বলেছিলেন, বর্তমান অবস্থায় তার কতটা সংসাধিত হয়েছে? যাঁরাই খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে অধিকাংশ স্কুলেই উপযুক্ত মানের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞান-শিক্ষক পাওয়া যায় না।

অনেক ক্ষেত্রেই নানা জোড়াতালির সাহায্যে নিয়মকানুনকে চোখ-ঠা
ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে নয়া-দিল্লীতে 'সারা-ভা
মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল'-এর যে অধিবেশন হয়ে গেছে, তাতে পা
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাধ্যক্ষ (Pro-Vice-Chancellor) ডাঃ এ. সি. ঘো
বলেছেন যে যদিও তাঁর রাজ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্কুলকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নী
করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তাদের শতকরা ১ ভাগেও ভালো শিক্ষকের ব্যব
করা যায় নি, এবং পরীক্ষায় 'ফেলের' সংখ্যাও সেইজন্য এত বেশি। তি
বলেছেন যে বিশেষ করে অভাব হচ্ছে অঙ্ক, বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষকে
এইরূপ অসুবিধা জানিয়েছেন বিহার, অন্ধ্র ও কেরলের প্রতিনিধিরা। গুজরা
তো ১১শ শ্রেণী খোলা বন্ধ করে দিয়ে দু-বছরের 'জুনিয়র কলেজ' খোলা
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ, সেই পুরনো ১০ বছরের স্কুল ও দু-বছরের 'ইন্টা
মিডিয়েট' পড়ার ব্যবস্থা। (স্টেট্‌স্‌ম্যান্—২৯।১০।৬৩)

শিক্ষক সমস্যা

শিক্ষকদের কথাটা বারবার আলোচিত হয়েছে। শিক্ষকদের অবস্থাটা এবা
চাক্ষুষ করুন :

তালিকা—জ

ভারতে শিক্ষকদের শিক্ষার মান

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক	ম্যাট্রিক ও তদূর্ধ	ম্যাট্রিক নয়	বৃত্তি-শিক্ষা প্রাপ্ত	বৃত্তি-শিক্ষ নাই
১৯৪৯-৫০	৪৫,৫৩৪ (৮.৭৯%)	৪,৭২,৩৬৪ (৯১.২১%)	৩,০২,০৫০ (৫৮.৩২%)	২,১৫,৮ (৪১.৬৮%
১৯৫৭-৫৮	২,০৯,৯০৩ (২৮.৭৮%)	৫,১৯,৩৩৬ (৭১.২২%)	৪,৬৩,০৬৩ (৬৩.৭৩%)	২,৫২,১ (৩৬.২৭%
মধ্য স্কুল শিক্ষক				
১৯৪৯-৫০	৩৫,২২৮ (৪৪.৬৭%)	৪৩,৬৩৭ (৫৫.৩৩%)	৪১,৪৭৮ (৫২.৬%)	৩৭,৩ (৪৭.৪%
১৯৫৭-৫৮	১,০০,৩০৭ (৫৪.২০%)	৮৪,৭৬৫ (৪৫.৮০%)	১,১৬,০২১ (৬২.৬৯%)	৬৯,০ (৩৭.৩১%

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক	স্নাতক	অস্নাতক	বৃত্তিশিক্ষা প্রাপ্ত	বৃত্তিশিক্ষা নাই
১৯৪৯-৫০	৪৮,২৭৫ (৪১.৫৬%)	৬৭,৮৮২ (৫৮.৪৪%)	৬২,২৪৭ (৫৩.৫৯%)	৫৩,৯১০ (৪৬.৪১%)
১৯৫৭-৫৮	১,০৫,৬৩৮ (৪৭.৬৫%)	১,১৬,০৫৭ (৫২.৩৫%)	১,৩৯,১৭৫ (৬২.৭৮%)	৮২,৫২০ (৩৭.২২%)

উপরোক্ত তালিকা থেকে অবস্থাটা খানিকটা বোঝা যাবে। ৮ বছরে অবস্থার উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু যাবার পথ কতোটা বাকি আছে, সেটা হিসেব করবেন। মাধ্যমিক-শিক্ষা কাউন্সিলে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা লক্ষ্য করলে বর্তমানেও অবস্থার ভয়াবহতা বোঝা যাবে। এই পরিসংখ্যানে উল্লেখ নেই যে উচ্চ শ্রেণীতে পড়াতে গেলে আশা করা হচ্ছে যে শিক্ষক, হয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর (এম এ./এম. এস. সি.) অধিকারী, নয়তো স্নাতক পর্যায়েই সম্মানের (Honours) সঙ্গে পাশ করেছেন। এই পর্যায়ের হিসাব মিলছে না। তাছাড়া অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়াও দুরূহ—তারও হিসাব মিলছে না।

কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ভিড়

এই সূত্রে আর একটি তালিকা লক্ষ্য করুন :

তালিকা—ঝ

বৎসর	কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ	ছাত্র সংখ্যা (লক্ষে)
১৯৪৯-৫০	৪৮৮	৩.৩১
১৯৫৮-৫৯	৯১৩	৮.০০
১৯৬০-৬১ (আনুমানিক হিসাব)	১০৫০	৯.০০
১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	১৪০০	১৩.০০

এ কথা আরও বলা হয়েছে (পৃঃ ৮০৭, পাদটীকা) যে ১৯৫০-৫১তে বিজ্ঞানের ছাত্র সংখ্যা যেখানে ছিল ১,৪০,০০০, সেখানে ১৯৬০-৬১ সালে এদের সংখ্যা হবে ৩,২৩,০০০। সমগ্র ছাত্র-সংখ্যার তুলনায় অনুপাত কিন্তু কমেছে। ১৯৪৯-৫০এ বিজ্ঞান পাঠরত ছাত্রদের অনুপাত ছিল শতকরা ৩৮.১, ১৯৬০-৬১ সালে তা কমে হচ্ছে শতকরা ৩৫.৮। এর অর্থ বিজ্ঞান-শিক্ষা বাড়লেও মূল ঝোঁকটা থেকে যাচ্ছে অপর দিকে। এ অবস্থার কারণ দর্শানো হচ্ছে নিম্নরূপ : (১) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচুর প্রসার হচ্ছে ; (২) মাধ্যমিক

শিক্ষা উত্তীর্ণ হলে পর উপার্জনযোগ্য কাজ জুটছে না ; (৩) মাধ্যমিক [illegible] বিভিন্নমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা নাই ; (৪) বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার প্রতি চিরাচরি[illegible] সামাজিক মোহ ও (৫) বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষায় ইচ্ছুক ছাত্র মাত্রকেই গ্রহণে[illegible] জন্য সামাজিক চাপ থেকেই যাচ্ছে।

এর ফল : কলেজে ভিড় ; উচ্চ-শিক্ষার পর্যায়ে অযোগ্যতা, শিক্ষা[illegible] মানের অধোগতি, ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রবণতা, শিক্ষা[illegible] 'অপচয়', স্নাতক ও স্নাতক-পূর্বদের মধ্যে বেকারি।

একটা পাপচক্র সৃষ্টি হয়েছে। যথোপযুক্ত, যথা সংখ্যক বিজ্ঞান শিক্ষকে[illegible] অভাবে মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্নমুখী শিক্ষা, বিশেষত বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসা[illegible] হচ্ছে না। মাধ্যমিক স্তরে যথোপযুক্ত বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রের অভাবে— (অন্যতম কারণ হিসাবে স্বীকৃত)—উচ্চ স্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার হচ্ছে না। এই পাপচক্রকে ভাঙতে না পারলে এগোনো যাবে না, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানে শিক্ষা

এবারে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কথা।

তালিকা—ঞ

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছাত্র ভর্তি সংখ্যা—১৯৫৯ সাল

শাখা	আসন সংখ্যা ডিগ্রী	ডিপ্লো[illegible]
১। বাস্তুবিদ্যা (Civil Engineering)	৪,১৯২	১০,২[illegible]
২। যন্ত্রবিদ্যা (Mechanical „)	২,৩২৫	৪,৫[illegible]
৩। তাড়িত যন্ত্রবিদ্যা (Electrical Engineering)	২,৩২৯	৪,[illegible]
৪। তাড়িত সমাযোজনা বিদ্যা (Electrical Communication Engineering)	৩৭৫	২[illegible]
৫। খনিজ বিদ্যা (Mining)	২৯০	৪[illegible]
৬। ধাতু বিদ্যা (Metallurgy)	২৩৯	[illegible]
৭। রাসায়নিক যন্ত্রবিদ্যা ও রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ্যা (Chemical Engineering and Chemical Technology)	৪৮৫	
৮। বয়ন প্রযুক্তিবিদ্যা (Textile Technology)	২৮২	৩[illegible]
৯। স্থাপত্য বিদ্যা (Architecture)	২৮৫	
১০। অন্যান্য (Other Fields)	৯৭৫	২[illegible]
মোট—	১১,৭৭৭	২১,[illegible]

উপরোক্ত তালিকায় প্রযুক্তিবিদ্যার মোট প্রসার ও তার বিভিন্ন শাখার আনুপাতিক গুরুত্ব বোঝা যাবে। সেই সঙ্গে বোঝা যাবে এ দেশে শিল্পায়নের অগ্রগতির রূপ। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তিন বছর শিক্ষাক্রমের 'নিম্ন প্রযুক্তিবিদ্যার স্কুল' (Junior Technical School) খোলার পরিকল্পনা সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে আরও দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয় : এই শিক্ষার প্রসারে বেসরকারী উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত লোকের চাহিদা তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রায় মিটবে, চতুর্থ পরিকল্পনায় তো বটেই।

শিক্ষিত বেকার সমস্যা

শিক্ষিত বেকারের সমস্যাটি এই সূত্রেই কিছুটা তুলে রাখা দরকার।

তালিকা—ট

বৎসর	'এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' সংখ্যা	বৎসরের শেষে 'চলিত তালিকায়' (Live Register) চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা
১৯৪৭	৭৫	২,৩৬,৭৩৪
১৯৪৮	৭৭	২,৩৯,০৩৭
১৯৪৯	১০৯	২,৭৪,৩৩৫
১৯৫০	১২৩	৩,৩০,৭৪৩
১৯৫১	১২৬	৩,২৮,৭১৯
১৯৫২	১৩১	৪,৩৭,৫৭১
১৯৫৩	১২৬	৫,২২,৩৬০
১৯৫৪	১২৮	৬,০৯,৭৮০
১৯৫৫	১৩৬	৬,৯১,৯৫৮
১৯৫৬	১৪৩	৭,৫৮,৫০৩
১৯৫৭	১৮১	৯,২২,০৭৯
১৯৫৮	২১২	১১,৮৩,২৯৯
১৯৫৯	২৪৪	১৪,২০,৯০১
১৯৬০	২৯৬	১৬,২০,২৪২
১৯৬১ (জুন)	৩১২	১৭,৫৫,৪৯১.

উপরোক্ত তালিকাটি বিচার করতে গেলে কয়েকটি জিনিস ম… দরকার: প্রথমত, সকল কর্মপ্রার্থী নাম তালিকাভুক্ত করান না; … পান না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের' সংখ্যা বেড়েছে, … বেকারের সংখ্যাও বেশি তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে শহরে; সুতরাং উপরোক্ত বেকাররাও প্রধানত শহরে। … বেকারির ছায়া এতে সামান্যই পড়েছে। এবারে এদের মধ্যে শিক্ষিত বেক… অংশটা দেখা যাক।

তালিকা—৯

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

বৎসর	প্রবেশিকা পাশ	ইণ্টারমিডিয়েট পাশ	স্নাতক: ইঞ্জিনিয়ারিং	স্নাতক: মেডিকেল	স্নাতক: অন্যান্য	স্নাতক: মোট	
১৯৫৩	১,২৫,২৮৯	১৭,৩৪৪	১,০৮৭	২২৫	১৯,২৩১	২০,৫৪৫	১,৬৩
১৯৫৪	১,৪৫,০৮৯	২২,০৭১	৮৫৭	২২৫	২১,০৪৫	২২,১২৭	১,৮৯
১৯৫৫	১,৬৪,০৬১	২৫,৮৭২	৬২৮	১৭৯	২৫,৪১৭	২৬,২২৪	২,১৬
১৯৫৬	১,৮৬,৯৭৮	৩০,৬৪০	৪৮১	২১৩	২৬,০৮০	২৬,৭৭৪	২,৪৪
১৯৫৭	২,৩৬,৫০৯	৩৮,৭৬২	৫১১	১৭১	৩১,৬০৫	৩২,২৮৭	৩,০৭
১৯৫৮	২,৮৩,২৬৮	৪৪,৫৭৫	৫১৮	১৮৬	৩৫,৮৪৫	৩৬,৫৪৯	৩,৬৪
১৯৫৯	৩,৪৪,৩২৯	৪৯,১৪১	৫৯৮	১৪৩	৩৮,৯০০	৩৯,৬৪১	৪,৩৩
১৯৬০	৩.৯৯,৮৮০	৬০,৭৫৬	১,১৯০	২৬২	৪৫,১৩২	৪৬,৫৮৪	৫,০৭
১৯৬১ (জুন)	৪,৪৭,১৩৭	৬৯,৭৪০	৯৩৯	২২৬	৪৯,৫০৫	৫০,৬৭০	৫,৬৭

বেকার সমস্যা ও শিক্ষিত বেকার-সমস্যার কোনো মৌলিক আলো… এখানে খাপ খাবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শিক্ষিত বেকারের … নিয়মিত বাড়ছে। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের বেকারি সাময়িক। পা… পাশের প্রথম দিকে বেকারের দলে নাম লেখালেও অল্প দিনের মধ্যেই … উপার্জনে লেগে যায়। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেকারি বেশি এবং ক্রমবর্ধ… উচ্চ-মাধ্যমিক ও কলেজী-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনায় যে কথাটা বারবার

হয়েছে, এই বেকারির ক্ষেত্রেও সেটা আবার প্রমাণিত হল। দেশের শিল্পায়ন, শিক্ষার প্রকৃতির রূপান্তর—এ ছাড়া পথ নেই। সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিই, সব কমিটি, কাউন্সিল, কমিশন ও কনফারেন্সই এই কথার পুনরুক্তি করেছেন। কিন্তু অতীতের রেখা ধরে পাদচারণা করা ছাড়া, কিছুতেই আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না।

বেরিয়ে কিন্তু আসতেই হবে। স্বাধীনতা এসেছে; গণতান্ত্রিক সংবিধান হয়েছে; শিল্পের ও শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে, সমাজতন্ত্রের আদর্শ স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু বহু প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসে নি। যে মৌল পরিবর্তন জনমানসকে স্বাধীনতার কামনায় উদ্বেলিত করেছিল, সে পরিবর্তন আজও আসে নি। পুরনো চিন্তা ও নক্সার বাধা ভেঙ্গে নতুন সৃষ্টির জগতে বেরিয়ে আসতে হবে—এই হল আজকের ভারতের দাবি। আগে কৃষির সম্বন্ধে বলেছি। শিল্পায়ন সম্বন্ধে বলতে চাই: দেশের মানুষের শিক্ষা ও চিন্তাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাভিমুখী করে তুলতে হবে শিল্পায়নেরই খাতিরে। কমিশনের দপ্তরে বসে কটা নতুন কারখানায় কত নতুন শিক্ষিত শ্রমিক-কর্মচারী লাগবে, এ হিসেবে পরিকল্পনার অগ্রগতির হার খুঁড়িয়েই চলবে। নতুন চিন্তায় অনুপ্রাণিত মানুষ চাই। ব্যাঙ্ক তো জাতীয়করণ করবেন বলছেন। দেশের কাঁচা মাল, যেমন আকরিক লোহা, বিদেশে পাঠাবার দরকার নেই। শিক্ষিত যুবকদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দিন, ছোট কারখানা, মাঝারি কারখানা, ব্যক্তিগত মালিকানা বা ইনডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ গড়ে উঠতে দিন; শিল্পায়নের কাজে সাধারণ মানুষের উদ্যোগকে বন্ধনমুক্ত করে দিন—শিল্পায়নের হার বাড়বে। আধুনিক অগ্রবর্তী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা সম্ভব হবে। গণতন্ত্রের ভিত্তি হবে দৃঢ়। আজকে তাই শিল্প বিপ্লবের জন্যে, তারই পাশাপাশি চাই শিক্ষা-বিপ্লব—শিক্ষার জন্যে Crash Programme!

অবশ্যই তার জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হবে। প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে খরচ হয়েছিল ১৬৪ কোটি টাকা বা মোট খরচের শতকরা ৭ ভাগ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তার পরিমাণ ছিল ৩০৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৬·৪ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছে ৬০ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা ৭·৫ ভাগ। মৌলিক পরিবর্তন আনতে গেলে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন আছে। শিক্ষার বিষয়টা উপেক্ষণীয় এ কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না! প্রশ্ন

হচ্ছে আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে। আমার ধারণা সামাজিক, অর্থনৈতি
রাজনৈতিক গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষা বর্তমানে যে গুরুত্ব পাচ্ছে,
চেয়ে অনেকগুণ বেশি গুরুত্ব তার প্রাপ্য। অন্য ক্ষেত্রে সেজন্যে ত্যাগস্বী
করতে আমরা প্রস্তুত আছি কি ?

নিরক্ষরতার চাপ

আরও দুটি বিষয় উত্থাপন করে এ আলোচনায় ছেদ টানতে চাই। প্রথমটি
নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের কাহিনী। সমগ্র জনসংখ্যার তুল
'সাক্ষর', অর্থাৎ, লিখতে-পড়তে-জানা লোকের অনুপাত হল এইরূপ :

তালিকা ড

জনসংখ্যার তুলনায় সাক্ষর লোকের শতকরা অংশ

		১৯৫১	১৯৬১
পুরুষ	…	২৪·৯	৩৩·৯
নারী	…	৭·৯	১২·৮
মোট	…	১৬·৬	২৩·৭

অর্থাৎ, ১০ বছরে লিখনপঠনক্ষম লোকের অনুপাত বেড়েছে শত
৭·১ ভাগ ; এর মধ্যে পুরুষদের মধ্যে বেড়েছে শতকরা ৯ ভাগ এবং মেয়ে
মধ্যে বেড়েছে শতকরা ৪·৯ ভাগ।

এ অবস্থা পরিবর্তনের উপায় ছিল দুটি : প্রথমত, বাধ্যতামূলক প্রাথমি
শিক্ষা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ; দ্বিতীয়ত, ব্যাপকভাবে গণ-সাক্ষরী
অভিযান (mass literary campaigns) চালিয়ে। স্বাধীনতার
সরকার কতক কতক এলাকায় দ্বিতীয় কাজটি শুরুও করেছিলেন। কিন্
কর্মতৎপরতা জিইয়ে রাখা যায় নি। বর্তমানে প্রথমটির ওপরই ভরসা
হচ্ছে। অবশ্য প্রাপ্তবয়স্কের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার এখনও
৫০ হাজার কেন্দ্র চালান ; তাতে ১২ লাখ লোক ভর্তি হয় ; সরকারের
বছরে গড়ে ৮০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। তবে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি
পালটিয়েছে। তাঁরা নিরক্ষরকে শুধুই সাক্ষর করার ওপর জোর দিচ্ছেন
তাঁরা মনে করেন, লেখা-পড়া শেখানোর পাশে পাশে নাগরিকতা-শি
স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের স্থান সম্পর্কে সচেতন

বৃত্তি-শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ে চর্চার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই কার্যক্রমকে তাঁরা সামাজিক শিক্ষা নামে অভিহিত করে 'কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট' পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সরকারী কার্যক্রম তার নিজস্ব চালে চলতে থাকুক। সে বিষয়ে এখানে বিশেষ আলোচনা করতে চাই না। শুধু প্রশ্ন জাগে : বেসরকারী পরিকল্পনা এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে না কেন ? গণতন্ত্রে বিশ্বাসবান রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন ও সাধারণ শিক্ষিত নাগরিকের এ ক্ষেত্রে কোনো গণতান্ত্রিক দায়িত্ব নেই কি ?

স্ত্রীশিক্ষা

এবার সর্বশেষ প্রসঙ্গ : স্ত্রীশিক্ষা !

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে ১৯৬১ সালে ভারতবর্ষে শতকরা ১২·৮ জন নারী লিখতে পড়তে জানেন।

কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা কতটুকু এগিয়েছে তা নিচের তালিকায় পাওয়া যাবে।

তালিকা ঢ

বিভিন্ন শিক্ষা-ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা

শিক্ষাক্ষেত্র	১৯৪৯-৫০	১৯৫৮-৫৯
প্রাথমিক শিক্ষা (১ম-৫ম শ্রেণী)	৫১,৩২,৬০৭	৯৬,৬৩,৭২৬
মধ্যশিক্ষা (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী)	৪,৬৭,৯৬১	১২,৩৯,৯৬৯
উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা (৯ম-১১শ শ্রেণী)	১,৪০,৩৬৬	৪,৩৪,৯২৪
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	৩৬,০৪০	১,২৪,৬৬৭
কৃষি কলেজ	১৩	৯৫
বাণিজ্য কলেজ	১১১	৫৮০
এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৮	১৫০
আইন কলেজ	২২৬	৫৯৭
মেডিক্যাল কলেজ	২০১৬	৫৮৬৭
শিক্ষক-শিক্ষন কলেজ	১৬২০	৮১৭০
প্রযুক্তিবিদ্যা কলেজ	১৯	১৬
পশুচিকিৎসা-বিজ্ঞান কলেজ	৫	১৬৬

শিক্ষাক্ষেত্র	১৯৪৯-৫০	১৯৫৬-৫৯
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৭৭১	৫৯৭৩
বৃত্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্কুল	৩৫,৭৬০	৬৯,৯৪৩
কৃষি স্কুল	১৫	৫৩
চারু ও কারুশিল্পের স্কুল	৬,৩৫৩	১২,০১১
বাণিজ্য স্কুল	১,৯৮৫	:৩,৪৭৮
এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	৬	১১৫
প্রযুক্তি ও শিল্পবিজ্ঞান স্কুল	৭,৭৭৭	১৩,৮২৩
শিক্ষক-শিক্ষন স্কুল	১৬,৯৮০	২৪,৬৭১

তালিকা 'ছ'তে আমরা আগেই দেখেছি যে ১:৬০-৬১ সালে ৬-১১ বছ মেয়েদের শতকরা ৪০.৪ ভাগ, ১১-১৪ বছরের মেয়েদের শতকরা ১০.৮ ভ এবং ১৪-১৭ বছরের মেয়েদের শতকরা ৪.২ ভাগ স্কুলে পড়তে পারছে। থেকে বলা যায় যে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মেয়েই ১১ বছরের পরে স্কু যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। হয়তো বা তারও আগে থেকেই। কারণ, আম জানি '৬-১১' বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'অপচয়ের' পরিমাণ যথে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ হয়তো এ হার শতকরা ৮৫-তে দাঁড়াবে। অগ্রগতি এই শামুকের চালে গণতন্ত্রের শক্তির কী অসম্ভব অপচয় তা হিসেব করা শ নয়। সংগঠিত নারী আন্দোলন ছাড়াও, জনসংগঠনগুলিরও কি এ সম কোনো বক্তব্য থাকবে না ?

তবু তালিকা 'ট'-এর গুরুত্ব আছে। ১৪-১৭ বছরের মেয়েদের শতক ৩-৪ অংশ যা স্কুলের গণ্ডী পেরোচ্ছে, তাদেরই একটা অংশ কোনো উচ্চ শিক্ষ দিকে যাচ্ছে তার কিছুটা ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে। কিছু কিছু মেয়েরা যে কৃ এঞ্জিনিয়ারিং, বাণিজ্য, আইন ও পশু চিকিৎসার কলেজে পড়তে শুরু করে এটা আনন্দের কথা। ভবিষ্যতের ওপর এর ছাপ পড়বে। কলা ও বিজ্ঞা কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও শিক্ষক-শিক্ষন কলেজে মেয়েরা আগেও পড় এখন আরও বেশি করে পড়ছে। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক স্কুলেও মেয়েদের ভিড় বে বাড়তে শুরু করেছে। শুধু পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার নয়, স্বতন্ত্র উপার্জন ক্ষমতা সমাজে মেয়েদের গণতান্ত্রিক স্থান নিশ্চিত করবে। কিন্তু সামগ্রি অবস্থার তুলনায় এগিয়ে চলার গতি কী মন্থর! দেশের এই অর্ধেক মানু জন্য গণতন্ত্রের আবাহন হবে কবে ?

টীকা

১. *Central Advisory Bodies :—*

(1) Indian National Commission for Cooperation with Unesco (1949), (2) Advisory Board for Social Welfare (1951, 1954), (3) Board of Scientific Terminology (1950), (4) Central Board of Physical Education (1950, 1956), (5) Hindi Siksha Samiti (1951), (6) National Board of Audio-Visual Education (1953), (7) All India Council for Sports (1954, 1959), (8) National Advisory Council for the Education of the Handicapped (1955), (9) All India Council for Secondary Education (1955), (10) National Council for Rural Higher Education (1956), (11) Central Committee for Educational Research (1957), (12) All India Council for Elementary Education (1957), (13) Children's Literature Committee (1958), (14) National Council for Women's Education (1959), and (15) Central Sanskrit Board (1959).

২. *Annual Publicatians :—*

(1) Education in India (in 2 volumes), (2) Education in the States, (3) Education in Indian Universities, (4) Directory of Institutions of Higher Education.

Quarterlies Published :—(1) Education Quarterly, (2) Secondary Education, (3) Youth, (4) Indian Journal of Educational Administration and Research.

৩. *Universities :—*

(1) Agra University (1927), (2) Aligarh Muslim University (1921), (3) Allahabad University (1887, Re 1921), (4) Andhra University (1926), (5) Annamalai University (1929), (6) Banaras Hindu University (1916), (7) Baroda University (1949), (8) Bihar University (1952, Re 1960), (9) Bhagalpur University (1960), (10) Bombay University (1857, Re 1928, 1953)' (11) Burdwan University (1960), (12) Calcutta University (1857, Re 1951, 1954), (13) Delhi Uninersity (1922, Re 1952), (14) Gauhati University (1948), (15) Gorakhpur University (1957), (16) Gujarat University (1949), (17) Indira Kala Sangeet Vishvavidyalaya (1956), (18) Jabalpur University (1957), (19) Jadavpur University (1955), (20) Jammu and Kashmir University (1948), (21) Kalyani University (1960), (22) Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University (1961), (23) Karnatak University (1949), (24) Kerala University (1937, Re 1957), (25) Kurukshetra University (1956), (26) Lucknow University (1921), (27) Madras University (1857, Re 1904, 1925, 1929), (28) Marathwada University (1958), (29) Mysore University (1916), (30) Nagpur University (1923), (31) Osmania University (1918, Re 1947, 1950, 1950), (32) Punjab University (1947), (33) Patna University (1917, Re 1952,

1960), (34) Poona University (1949), (35) Rajasthan University (19… (36) Ranchi University (1960), (37) Roorkee University (19… (38) Sardar Vallabhbhai Vidyapeeth 1955), (39) Saugar Univer… (1946), (40) S. N. D. T. Women's University (1957), (41) S… Venkateswara University (1954), (42) U. P. Agricultural Univer… (1960), (43) Utkal University (1943). (44) Varanaseya Sanskrit Vish… Vidyalaya (1958), (45) Vikram University (1957), (46) Visva-Bhara… University. (1951).

৪.

(1) National Chemical Laboratory, Poona ; (2) Central Foo… Technological Research Institute, Mysore ; (3) Regional Resear… Laboratory, Hydrabad ; (4) National Aeronautical Laborator… Bangalore ; (5) Central Indian Medicinal Plants Organisation, Ne… Delhi ; (6) National Physical Laboratory, New Delhi ; (7) Centr… Road Research Institute, New Delhi ; (8) Indian Institute of Biochemistr… and Experimental Medicine, Calcutta ; (9) National Metallurgic… Laboratory, Jamshedpur ; (10) Central Glass and Ceramic Researc… Institute, Calcutta ; (11) Central Electrochemical Research Institu… Karaikudi ; (12) Central Public Health Engineering Research Institu… Calcutta ; (13) Central Fuel Research Institute, Jealgora ; (14) Centr… Drug Research Institute, Lucknow ; (15) Regional Research Laborator… Assam ; (16) National Botanical Garden, Lucknow ; (17) Centr… Mining Research Station, Dhanbad ; (18) Central Scientific Instrume… Organisation, New Delhi ; (19) Central Salt Research Institu… Bhavnagar ; (20) Regional Research Laboratory, Jammu ; (21) Centr… Building Research Institute, Roorkee ; (22) Central Electron… Engineering Research Institute, Pilani ; (23) Central Mechanica… Engineering Research Institute, Durgapur ; (24) Central Leathe… Research Institute, Madras ; (25) Birla Industrial and Technologica… Museum, Calcutta ; (26) Central Scientific Instruments Organisatio… Delhi.

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

অঙ্গন থেকে প্রাঙ্গনে

আমাদের বাল্যকালেই কিন্তু এসব শিক্ষকেরা একে-একে বিদায় নেন। কারণ, সরকারী শিক্ষাবিভাগের নিয়মে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের তুলনায় এঁদের বিদ্যা তুচ্ছ। দেশে শিক্ষার জোয়ার লাগছিল, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৎসরে বৎসরে বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের নিয়মের ফাঁসও তাই কঠিন থেকে কঠিনতর করে বাঁধা আরম্ভ হয়েছিল—হয়তো তা আরম্ভ হয়েছিল 'ফুলারি আমল' থেকেই পূর্ব বাঙলায়। বাল্য ছাড়িয়ে কৈশোরে যখন পৌছচ্ছি তখন স্কুলটার আরও ভাগ্য-বিবর্তন ঘটল। স্কুলের তখন ছাত্রভাগ্যে সুদিন—এই ছাত্র-ঐশ্বর্যবান্ স্কুলটার সামনে এমন সময় সরকারী সাহায্যের প্রস্তাব এল—দুর্দিনে তার নামগন্ধও পাওয়া যায় নি। টোপটি স্কুলের হেডমাস্টার ও পরিচালকরা সোৎসাহে গলাধঃকরণ করলেন। কারণ, কাঁচা টিনের চালার ও বাঁশের বেড়ার ঘরের পরিবর্তে প্রকাণ্ড পাকা বাড়ি উঠবে সরকারী সাহায্যে, মাস্টারমশায়দেরও বেতনের হার এক লাফে অনেক উঁচুতে উঠবে। সত্যই তা হল। কিন্তু তা হতে না হতেই স্কুলের সাহায্য-শর্তানুযায়ী কয়েকজন শিক্ষক বলি গেলেন, তাঁরা 'ট্রেনড্' নন। অনেক নতুন শিক্ষক এলেন। বহুদিনের হেডমাস্টার মহাশয়ের উপরেও আনা হল এক নতুন হেড মাস্টার। কারণ তিনি বি-এও নন, মাত্র সেদিনের বি. এ. ফেল।

বি. জি. নাগরকার মরহাট্টি ব্রাহ্মণ। খ্যাতি ও অখ্যাতিতে ভদ্রলোক মনে রাখবার মতো মানুষ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ; প্রার্থনা সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগদানও করেছিলেন, ছিলেন সেখানে নববিধান সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি খ্যাতনামাদের কনিষ্ঠ সহকারী। কি করে তারপর কি ঘটে

তা অনিশ্চিত। কিন্তু কুড়ি বাইশ বছর পরে পূর্ব বাঙলার এক গ্রামে বি. ডি. নাগরকর এসে ঠেকেছিলেন হেড মাস্টাররূপে—খ্যাতি হার্ভাডের বি. এ., খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী, এক খ্রীষ্টান মহারাষ্ট্রীয় ডাক্তার মহিলার স্বামী, গুটি তিন কিশোর কিশোরীর পিতা। এখানে তিনিই প্রথম উদিত হলেন, এ স্কুলের নববিধানের হেড মাস্টার। জীবনযাত্রায় তিনি সাহেব, ইংরাজিতে কেতাদোরস্ত, এমন কি সাহেবদের ক্লাবের একমাত্র ভারতীয় মেম্বর। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনে যা ঘটেছিল তাও শীঘ্রই বোঝা গেল—তা বিলিতী আদব-কায়দার সঙ্গে বিলিতী মদের প্রবলতর প্লাবন। আয়টা সাহেবদের মতো নয়, কাজটাও স্কুলমাস্টারি; তার ওপরে এমন মুহূর্তে যখন একজন সম্মানিত পুরাতন হেড মাস্টার হলেন অপদস্থ, এমন শহরে যেখানে টেম্পারেন্স সোসাইটির রিপোর্টে পড়েছি দশ বৎসরে মাত্র একটি লোক মাতলামোর জন্য গ্রেফতার হয়েছিল। অন্তত আমরা তো ও শহরে মেথরদের ছাড়া বিশেষ কাউকে মাতলামো করতে দেখি নি। মুসলমানদের তো মদ্যপান ধর্মে নিষিদ্ধ, হিন্দু ভদ্রলোকেরও তা সর্বথা পরিত্যজ্য। নাগরকর মহাশয়ের শাসন শৃঙ্খলা, খেলাধুলায় উৎসাহদান, ইংরেজি বিদ্যা, বিশেষ করে ইংরেজি বাগ্মিতা পুষ্ট ছিল। তাঁর মুখে কেশব সেন বিষয়ে টাউন হলে যে বিস্ময়কর বক্তৃতা শুনি জীবনে তাই আমার শোনা প্রথম উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি বাগ্মিতা—কিছুতেই কিন্তু শিক্ষিত সমাজে আর তিনি শ্রদ্ধাভাজন হতে পারলেন না। তার ওপরে বছর না ঘুরতেই দেখা গেল—সেই অপদস্থ পুরনো হেডমাস্টার মহাশয় বৈষয়িক দুর্দিনে তাঁরই বিরূপতায় পেলেন অবকাশ গ্রহণের নির্দেশ। এর পরে নাগরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে সাধারণের ও ছাত্রদের ধূমায়িত বিরূপতা অশোভন আক্রমণে প্রচণ্ড হয়ে দেখা দেয়। তিনিও এ শহর থেকে বিদায় নিয়ে বহরমপুর কলেজে ইংরেজি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর অধ্যাপনায় সুনাম হয়েছিল শুনেছি, কিন্তু গোলযোগ বাধল বিশ্ববিদ্যালয় যখন দেখতে চাইল তাঁর হার্ভার্ড-এর ডিপ্লোমা। এমন দুর্যোগ পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও প্রিন্সিপাল-প্রফেসরের ঘটেছে। কেউ পার পেয়েছেন, কেউ পান নি। নাগরকার সেই যে অন্তর্হিত হলেন আর তাঁর খোঁজ কেউ এদেশে জানে না। আমাদের স্কুলে তিনি ধূমকেতুর মতো এসে ধূমকেতুর মতো মুছে যান—পুচ্ছ তাড়নায় তিনিও রেখে যান একটা কলঙ্করেখা, জালিয়ে যান ছাত্রদের মধ্যেও কয়েকটা অশোভন বিক্ষোভ।

নাগরকারী পর্বে যাঁরা স্কুল থেকে বিদায় নেন তাঁদের মধ্যে দু-একজনার কথা সকলের মনে থাকবে, বিশেষত হেডমাস্টার গিরিজা ঘোষ মহাশয়ের কথা। দাদারা তখন কলেজে পড়েন—হেড্‌মাস্টার গিরিজাবাবুকে সেই ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে সকৌতুক শ্রদ্ধায় বলতেন 'জ্যেঠামশায়'। তাঁরা এই হেড্‌মাস্টার মশায়ের বিদায়-অভিনন্দন দিলেন টাউন হলে অত্যন্ত বড়ো করে সভা ডেকে—তাতে স্কুলের পরিচালকদের অন্যায়ের প্রতি কটাক্ষ করতেও এই কলেজে-পড়া ছাত্ররা ছাড়লেন না। ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে উপহার দিলেন সোনার দোয়াত-কলম। বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য বাগ্‌-নৈপুণ্যহীন হেড্‌মাস্টার মহাশয় অভিভাষণের প্রতিবেদনে যা বললেন তা অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অনাড়ম্বর। শুধু এই: "তোমরা আমার পুত্র-তুল্য। তাই আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কালে তোমাদের মনে করিয়ে দিই পিতামাতা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ো না। তোমাদের তিনটি গল্প বলি।" বলে প্রথম বললেন, আলেকজেণ্ডারের কথা। দেশ থেকে সেনাপতি তাঁর মায়ের উগ্রতায় উত্যক্ত হয়ে অভিযোগ করে পাঠালে আলেকজেণ্ডার বললেন, "সেনাপতি জানে না—আমার মায়ের এক ফোঁটা চোখের জলে তার সমস্ত অভিযোগ ভেসে যাবে।" দ্বিতীয় গল্প শিবাজীর—মরাঠী সেনাধ্যক্ষরা মোগল দুর্গ দখল করে শত্রুর পরমা রূপসী নারীকে তাঁর কাছে এনেছেন উপঢৌকন। শিবাজী দেখলেন, বললেন, "মা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি যদি তোমার সন্তান হতাম তাহলে আমিও কত রূপবান হতাম। তুমি যাও—তুমি এদের অপরাধ নিও না।" তৃতীয় গল্পটি অনুরূপ—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃভক্তির একটি কাহিনী। "তোমাদের কাছে এই আমার শেষ শিক্ষা।" বলে হেড্‌মাস্টার মহাশয় বসে পড়লেন। একটি কথা বেশি নয়, একটি কথা কম নয়। সে সময়ে, সে পরিবেশে, এই অনাড়ম্বর মানুষের এই ভাষণের যে ছাপ পড়েছিল এত কালেও তা যখন সেদিনের বালকের মন থেকে মুছে যায় নি, তাতেই তার মূল্য অনুমান করা যায়। মানুষেরও তাতে কিছু মূল্য কি বুঝা যায় না? কিন্তু সত্যই তিনি পড়াতে পটু ছিলেন না, স্কুল পরিচালনারও শ্রী-ছাঁদ কৌশল সবই ছিল অনায়ত্ত। মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজের একটু ছোঁয়াচ তাঁর গায়ে লেগেছিল—কপটতা জানতেন না। তাঁরই আমলে স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়—দেশ তখন শিক্ষার জন্য পাগল, আর এই বেসরকারী স্কুল তাদের জন্য প্রথম দ্বার মুক্ত করে দেয়। পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র বইএর দোকান খুলে এই বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য হেড্‌মাস্টার বৃহৎ

পরিবারের বোঝা যখন বহন করছেন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন নির্জীব ভাবে,—স্কুল যখন নতুন নতুন শিক্ষক দিয়ে জোর কদমে চলেছে—তখন পৃথিবীর বহু ব… অর্থহীন ট্রাজিডিরই নিঃশব্দ নিদর্শন ছাড়া তাঁকে আর কিছু ভাবা সম্ভব হত না।

যে মাস্টারমশায়রা সরকারী সাহায্যের শর্তে অযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিলেন তাদের একজন সংবাদটা শোনামাত্রই পদত্যাগ করে চলে যান। তিনি বয়সের ও অবস্থার জোরে জয়ী হয়ে যান এই কারণে। বিনোদবিহারী দাস নর্ম্যাল পাশ বা পড়া, বাঙলা শিক্ষক, বয়স বেশি নয়। শহরে তাঁর দাদার ছিল হাতা-কড়া থেকে নানা গৃহ-উপকরণের ভালো দোকান। কিন্তু বিনোদবাবুর গুণ ছিল, আর শিক্ষার অনুরাগ ছিল। তাই দোকান চালাতে এসে তা ছেড়ে স্কুলের কাজে লেগেছিলেন। আর যেই সরকারী ব্যবস্থার কথা জানলেন অমনি দোকানে ফিরে গেলেন। যাবার সময় আমাদের ক্লাশে শেষবারের মতো অন্য উপদেশ দেবার সময় বললেন, “আমি দোকান দেখব বলেই এসেছিলাম। তারপর শিক্ষার আকর্ষণে এ কাজ নিই। ভুল আগেই বোঝা উচিত ছিল—দোকান পরিচালনাতেই এখন ফিরে যাব। একটা কথা মনে রেখো—চাকরি যতো বড়ই হোক, তা চাকরের কাজ। স্বাধীনবৃত্তিতে কষ্ট পেলেও অমর্যাদা নেই।” চাকর-রাজার দেশে এই বিদ্যাসাগরী মনোবৃত্তি একটা ব্যতিক্রম, কিন্তু তা ছিল। বিনোদবাবুর স্নেহদৃষ্টি সেই দোকান থেকেও আমাদের অভিসিঞ্চিত করত। বুঝতাম তাঁর মনে খেদ নেই। কিন্তু দেখতাম স্কুলের পুরাতন সহযোগী শিক্ষক ও ছাত্রদের সাহচর্য তখনো তাঁকে আনন্দ দেয়। আমাদের ছাত্রদের রায় যদি কর্তৃপক্ষের নিয়মের কাছে অবান্তর না হত তা হলে বলতাম—বিনোদবাবুর মতো সুযোগ্য শিক্ষক আমরা আর বেশি পাই নি। সেদিনের নর্ম্যাল স্কুল থেকে তাঁরা ইংরাজি বুলি শিখতে পান নি, কিন্তু শিখেছেন তখনকার অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান—আমাদের স্কুল-কলেজে যা শিক্ষার সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। বঙ্গ পণ্ডিতমহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও জ্যামিতির বিদ্যায় সকলকে চমৎকৃত করতেন। বিনোদবাবু যুবক, তখনো ত্রিশের নিচে—কিন্তু দীর্ঘদেহ, গম্ভীর হলেও প্রসন্ন শ্যামবর্ণ এই মাস্টারমশায়ের মুখে ছিল ব্যক্তিত্বের ছাপ। আর কাজে শৃঙ্খলা, সুচারু পাঠন-শক্তি। তিনি বাঙলা পড়াতেন। প্রায় অখাদ্য পাঠ্য বইগুলিকে তিনি সহনীয় করে তুলতেন। সবচেয়ে বড় কথা—স্কুলে তখন দু-একখানা বাঙলা

মাসিকপত্র আসত, সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের ‘সাহিত্য’ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতমহাশয় এসব মাসিকপত্রের পাঠক ছিলেন বলাই যথেষ্ট নয়। তিনি পড়ার অবসরে এসব মাসিকপত্র থেকে আমাদের নানা বিষয় পড়ে শোনাতেন। উচ্চারণ স্বচ্ছন্দ, কণ্ঠ গম্ভীর সরস, ছাত্রদের তাঁর পাঠ আকর্ষণ করত। কিন্তু পড়তেন কী বিষয়? রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একাধিক সদ্য-প্রকাশিত প্রবন্ধ। সে প্রবন্ধ কি আমরা বুঝতাম? মুগ্ধ হৃদয়ে সকলে শুনতাম, কৃতার্থ হতাম। আর নিঃসঙ্কোচে বলি কিশোর মনের বুঝবার শক্তিকে অবজ্ঞা না করে বিনোদবাবু যে তার বিকাশের আহ্বান দিয়েছিলেন, তাতে তিনি ভুল করেন নি,—পঞ্চাশ বৎসর পরেও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করব—তিনি অমৃতের বার্তা আমাদের কারো কারো মনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের নিয়মের শর্তে তিনি অযোগ্য—না হলে আমাদেরও ‘সাহিত্যে’র পক্ষে যোগ্য শ্রোতা বিবেচনা করেন!

শিক্ষক নতুন যারা এসেছিলেন নিয়মানুযায়ী তাঁরা যোগ্য। কেউ কেউ তা সত্ত্বেও যোগ্য এবং মানুষ। কিন্তু অনেকেই দু-এক বৎসর পরে অন্যত্র চলে গেলেন। তখন শহরে আরেকটি বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অরুণ স্কুল পাইকপাড়ার জমিদার অরুণচন্দ্র সিংহের প্রতিষ্ঠিত, তাঁরই নামাঙ্কিত। আমাদের ভালো শিক্ষকরা সেখানে অনেকে গেলেন—ছাত্ররাও অনেকে সে স্কুলে গেল। বাবা সে স্কুলেরও পরিচালকমণ্ডলীর একজন। কয়েক বৎসর পরে পরে তিনি ভুলুয়ার কার্যভার নিলে (১৯২০?) তার সম্পাদকও হন—স্কুলটি ক্রমেই খ্যাতিলাভ করে। কিন্তু সরকারী পক্ষের নানা অনুরোধ প্রলোভন সত্ত্বেও সে স্কুলকে তিনি সরকারী সাহায্যের রূপোর শিকল গলায় পরতে দেন নি। জুবিলী স্কুল শেষ পর্যন্ত (১৯২১?) অস্তমিত হলে তার শিক্ষক ও ছাত্ররা অরুণ স্কুলে যোগদান করে—সে আমাদের কালের অনেক পরে। আমরা কিন্তু জুবিলী স্কুলেই থেকে গেলাম। সে স্কুলে পড়াশুনার খ্যাতি নেই, ভালো ছেলেরা ওখানে প্রতিযোগিতার সুযোগ পায় না, ছাত্ররা খ্যাত দুর্দান্ত বলে, শৃঙ্খলা শিথিল আর উপকরণও অপ্রচুর। এমনি একটা শহরের ‘গুণ্ডা ছেলের স্কুলে’ অভিভাবকরা আমাদের সমর্পণ করে দিয়েছিলেন, ও স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কটা ভাঙতে চান নি। মনে হয় তাতে অন্যায় হয় নি—এই ঢিলেঢালা বেসরকারী স্কুলের সেই মুক্ত হাওয়ায় আড়ষ্ট হয়ে থাকি নি, তথাকথিত ডিসিপ্লিন নামীয় জুজুর ভয় ছিল না। কিন্তু সুযোগও ছিল অনেক

দিকে সংক্ষিপ্ত। ম্যাপ, গ্লোব পর্যন্ত স্কুলটায় বিশেষ ছিল না, ভূগোল প্রবেশি
পর্যন্ত পড়ানো হত না—অথচ ভূগোল ছিল আমার প্রিয় বিষয়। লাইব্রে
যৎসামান্য, ছাত্ররা কেন, মাস্টারমহাশয়রা অনেকেই সে সম্বন্ধে ছিলে
উদাসীন। আমাদের অবশ্য সে অভাব ভুগতে হয় নি, তা অন্য কারণে
খেলায় ছিল ছেলেদের বিশেষ উৎসাহ, আর তাতে আমরাও ঝুঁকে পড়ি
অবশ্য দেখেছি তাতেও আমরা জিলা স্কুলের কাছে অনেক সময়ে হেরে যেতাম
কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কাছে এখনো জুবিলী স্কুলের সেই স্বতঃস্ফূর্ত দুরন্তপনা
ক্রমঃস্ফুরিত দিনগুলিই স্কুলের জীবন। সেখানকার সতীর্থ ও শিক্ষকে
আমার কম দৌরাত্ম্য ভোগ করেন নি। স্কুলের সেই দুরন্তপনার ছাপ যে
কলেজে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মুছে গিয়েছিল—সেখানে সন্তর্পণে পা
ফেলতে হত। কারণ সেই ক্ষমাশীল শিক্ষক ও সহপাঠীরা তো আর এখানে
নেই। কলেজে আমার অশান্তপনার ক্ষমা কে করবে—যে ক্ষমা না চাইতে
জুবিলী স্কুলে পেতাম?

ত্রিপুরাকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন বাবার সহযোগী শিক্ষক। বি. এ. ফেল এ
খ্যাতনামা শিক্ষক মহাশয় অঙ্ক, সংস্কৃত, ইংরেজি তিন-তিনটি বিষয়েই চৌকোশ
আর ছেলেদের পাশ করাবার বিদ্যায় অদ্বিতীয়, এই ছিল তাঁর নাম। স
মিথ্যা নয়। অন্য স্কুলের ছেলেরাও সন্ধ্যায় তাঁর টিউশানির ক্লাশে পড়ত
আর আমাদের বাড়ির আমরা সেই সন্ধ্যার টোলেরই ছাত্র। কিন্তু ছেলে
বয়সে তাঁর সঙ্গে 'জ্যোঠা' ছেলের মতো অবাধে তর্ক করতাম। তিনি
আমাদের দু'টি কথা শুনিয়েছিলেন—সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারতে কী আছে
আর কী নেই, দ্বিতীয় কথা ব্যাকরণ বলতে পাণিনি। তৃতীয় একটি বিষয়
তাঁর মুখে শুনতাম—পুরাতত্ত্ব ও বৈদ্যজাতির মাহাত্ম্য—সম্ভবতঃ তা তাঁর সংগৃহীত
স্বর্গীয় উমেশ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসরণে। এইগুলো ছিল আমাদে
একই কালে কৌতূহলের ও সন্দিগ্ধ পরিহাসের বিষয়। ক্লাশে পড়বার ইচ্ছা না
হলে আমরা তুলতাম গল্প: "স্যর। রাম কি সত্যই বড় বীর ছিলেন?" "কেন
তোদের সন্দেহ কিসে?" ত্রিপুরা গুপ্ত মহাশয় হেসে বলতেন, "মূল রামায়ণ পড়ে
দেখবি—" কি দেখব তাতে একঘণ্টা অনায়াসে কেটে যেত। বলতেন, "হা
আমাদের দেশের পণ্ডিত দেখিস—সব ঐ কলাপ। পাণিনি চোখেও দেখে নি
মূল রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধেও ঐরূপই ছিল তাঁর বক্তব্য—ও না পড়লে সংস্কৃ
পড়া কেন? কখনো ক্লাশে তুলতাম যুদ্ধের কথা। তখন প্রথম মহাযু

চলছে—আমরা সকলেই জার্মান পক্ষ, তিনি ইংরেজ পক্ষ, "স্যর জেপলিন লণ্ডনে বোমা ফেলছে—" "হুঁ! ইংরেজও বড় দুর্ধর্ষ—কখনো হার মানে না।" অমনি যুদ্ধ বর্ণনা আরম্ভ হত। তিনি ন্যাপোলিয়নের ভক্ত—কিন্তু এ্যাবোট্-এর জীবনী না পড়লে কি ন্যাপোলিয়নকে বুঝা যায়? ক্লাশে অবশ্য পড়াশুনা প্রায়ই হত না। কিন্তু ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য তৈরি করতে তিনি জানতেন। খাতা দেখে লেখা শুদ্ধ করতে ছিলেন সুদক্ষ। আমি তো সেই সূত্রে তাঁর এত আপনার হয়ে গিয়েছিলাম যে, পরবর্তী কালেও ছাত্রজীবনের ফলাফল তাঁকে জানিয়েছি। তিনিও তাঁর ছেলেদের থেকে নিতেন আমার কুশলবার্তা। এ শিক্ষকের জাত কি লোপ পেয়ে গিয়েছে?

জাত-শিক্ষক আরেকজনের কাছে আমরা দু ভাই পড়েছি। তিনি জুবিলী স্কুলের শিক্ষক, পরে অরুণ স্কুলেও যোগ দেন। তবে তিনি শুধু শিক্ষক নন, একাধারে আত্মীয়, অভিভাবক, আর ক্ষমাশীল পরিচালক। তিনি স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রিন্সিপ্যাল অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতী সন্তানদের পিতা। এই বাড়ুজ্জেদের সঙ্গে কুলগত একটা কুটুম্বিতা ছিল, কিন্তু তা বহুগুণ হয়ে দাঁড়ায় বিদেশে বাদামতলার দীর্ঘ প্রতিবেশিকতায়। বাড়ুজ্জেদের আমরুজ গাছ ছিল আমাদের গ্রীষ্মের অবকাশ যাপনের কোটর। অফুরন্ত আমরুজ কচি থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা খেয়ে শেষ করতে পারতাম না। পরে তাঁরা বাসাবাড়ি তুলে পরিবার পাঠিয়ে দেন দেশে, সুরেশদা প্রায় পনের বৎসর বিশ বৎসর আমাদের বাসাবাড়িতেই বাস করতেন—আমাদের দু ভাইর পড়াশুনা তদারক করতেন। সেদিনের এনট্রেন্স উত্তীর্ণ হয়ে অবস্থার বিপাকে তাঁকে প্রথম যৌবনেই জীবিকার্জন করতে হয়—২০।২৫ টাকায় তিনি স্কুলের ক্লার্ক-কাম-টিচার। অভাবের সংসারে তদুপরি দু বেলা টিউশনি ছাড়া পথ নেই। সেই শনিগ্রহে ইচ্ছা থাকলেও ২০ বৎসর এরূপ সামান্য শিক্ষকতাতেই তার দিন কাটে। তারপরে আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা দিলেন, পাশ করলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর তখন কিছুটা পদ প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হোল কিন্তু তাঁর বিদ্যার, বুদ্ধির, বহুবিষয়ে সাধারণ ঔৎসুক্যের ও জ্ঞানের যে সুনিশ্চিত পরিধি বহু বহু পূর্বে রচিত হয়েছিল, পূর্বেকার বিশ বৎসরে ও পরেকার বাকী জীবনে তিনি তার আর্থিক সামাজিক কোনো দাম পান নি। একটা কারণ, তিনি আদায় করতে জানতেন না তাই সর্বস্বীকৃত সকলের প্রীতিভাজন, গুরুলঘু সকলের সমাদৃত হলেও তিনি সমাজে সংসারে যেন

ছায়াবৃত হয়েই থাকলেন। অথচ 'দারিদ্র্য নিষ্পিট ও আজন্ম দুর্বল স্বা
এই বিনয় নম্র প্রিয়দর্শন যুবক প্রথমাবধিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠাদের নি
পরম স্নেহভাজন।—স্কুল সেক্রেটারি বঙ্কিম বসুই হোন কিম্বা হেডমাস্টা
নাগরকরই হোন, স্কুলের খাতাপত্র হিসাব-নিকাশ সবাই নিশ্চিন্ত মনে তাঁ
হাতে দায়িত্ব অর্পণ করতেন। কারণ সে দায়িত্ব পালিত হবে নিঃসন্দে
তা পালনের জন্য কোনো ধন্যবাদও প্রত্যাশা করবেন না সুরেশ দা
নিজেকে যেন সকলের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিপুণভাবে কাজ করে যাওয়া
তাঁর স্বভাব। হয়তো এইখানেই তাঁর ব্যক্তিত্বের ত্রুটি, স্বাস্থ্যের জন্য হো
অবস্থার প্রতিকূলতায় হোক, তাঁর মধ্যে স্ফুরিত হতে পায়নি তাঁর আত্মপ্রকাশে
সাহস, নিজের প্রাপ্য আদায়ের শক্তি, প্রাণ-শক্তির স্বাভাবিক তেজ
তথাপি 'এমন শিক্ষক হয় না,' ছাত্ররা একবাক্যে তা ঘোষণা করতো 'এম
সহযোগী হয় না'—শিক্ষকেরাও অকপটে তা বলতেন। আর—কর্তৃপক্ষ
সুরেশ আছে বলে নির্ভাবনা।' আমার বাবার কাছে সুরেশ ছিলেন পুত্রাধি
—বিষয় কর্ম থেকে তাঁর টাকাকড়িরও কথা একমাত্র সুরেশ দাকেই তি
জানাতেন। আমার সে যোগ্যতা ছিল না, তিনিও জানতেন আমিও বুঝতাম।
আমার মায়ের কাছেও 'সুরেশ' ছিল তাই—এবং সেই কারণেই অনি
আমাদের বাড়িতে আপনার থেকেও বেশি আপনার। যারা প্রিন্সপা
অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যনিপুণতা, লেখা-পড়ায় সুপটুতা দেখে তাঁ
গুণমুগ্ধ—আমিও তাঁর একজন—তাঁরা সুরেশদার কিছু কর্মনিপুণতার ধারণ
পাবেন। কিন্তু তাঁরাও জানবেন না আরও অনেক জিনিস—ধৈর্য, সহিষ্ণুতা
নির্লোভ নিরভিমান মানুষের জীবনের সেই সকরুণ শ্রী। আমার পক্ষে
তাঁর কথা বলা প্রায় অসম্ভব—জীবনে বাবা ও দাদার মতো আর যে তিনজ
মানুষের নিকট আমি শিক্ষা-দীক্ষা ও মূল্যবোধের জন্য ঋণী সুরেশদা তাঁদে
একজন—আর লেখাপড়ার কথা বললে আমার মতো দুরন্ত অমনোযো
ছাত্রকে লেখাপড়া শেখানো যে কী কঠিন কাজ, তা এখন বুঝি।—গাধা
পিটিয়ে ঘোড়া করার যে কৃতিত্ব তা যদি সম্ভব হয়ে থাকে—তা হলে
সে কৃতিত্ব প্রধানত প্রাপ্য সুরেশদার। এমন শিক্ষকে যে পেয়েছে—যে
দেখেছে তাঁর সকল বেদনা—সে বাঙলা দেশের শিক্ষকসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা
রুদ্রকোমল সকল দাবিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে সমর্থন না করে পারে না। শিক্ষকদে
কথা মনে হলেই মনে পড়ে ভাগ্য প্রবঞ্চিত শিক্ষক সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যা

ভাগ্য প্রবঞ্চিত বলা হয়তো ঠিক নয়। কারণ, এমন কৃতী পুত্রদের যিনি পিতা তাঁর মতো ভাগ্যবান কে? সত্যই, সরস্বতী শিক্ষকদের অনেক লাঞ্ছনা দেন, কিন্তু এই পুরস্কারটি দিয়ে হয়তো তাঁদের সকল প্রাপ্য আবার মিটিয়ে দেন। নিজ ভাগ্যে না হোন পুত্রভাগ্যে তাঁরা অনেকেই সার্থক।

স্কুলের জীবনটা স্বল্প নয়—প্রায় ৯ বৎসর। এ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর জীবন যে পর্বে গিয়ে পড়ে তার নাম—প্রথম মহাযুদ্ধ। তার একটা ফল,—আমরা উদগ্রীব হয়ে দৈনিক ইংরেজী সংবাদ পত্র পড়তাম,—প্রথম ইংলিশম্যান, পরে 'বেঙ্গলী।' দেশের জীবনে স্বদেশীর পর্ব শেষ হয়ে বিপ্লবী দুঃসাহসিকতার পর্ব দেখা দেয়, তিলক ও হোমরুলের দিন আসে। আমাদের শহরের জীবনে সংক্ষেপে বলতে হবে একদিকে দেখা দেয় জীবন চাঞ্চল্য—মিস্টার জে-এন-গুপ্ত গ্রামে গ্রামে মেয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন। এখানে-ওখানে ইংরেজি স্কুল স্থাপনে যত্নপর ছিলেন। নিজে অন্য অফিসারদের নিয়ে স্কুলের ছাত্রদের খেলাধূলায় উৎসাহ দিতেন।—সব সময়েই খেলা, কিম্বা মেলা, কিম্বা একটা কিছু—অফুরন্ত তাঁর তৎপরতা। নিজেই নেমে পড়তেন ছেলেদের সঙ্গে খেলতে। তাঁর পুত্রদের বলতেন পাড়ায় আমাদের ডেকে নিয়ে একসঙ্গে খেলতে—আই-সি-এস্-এর বিলিতিআনার দূরত্ব সরিয়ে বাঙালীআনায় তিনি যেন নিজেও সুস্থ বোধ করতেন, দেশের মানুষকেও তাঁর স্পর্শে সুস্থ করে তুলেছেন। কিন্তু ওদিকে দক্ষিণ থেকে এ সময়েই মেঘনা আসছিল এগিয়ে, শহরে তাই কলেজ স্থাপনে মিস্টার গুপ্ত যখন সংকল্প করেও দ্বিধা করছেন—এমন সময়ে একবার ছোটলাট কারমাইকেল এলেন শহরে। তারপরে—কী রিপোর্ট তিনি পেয়েছিলেন কে জানে—মিস্টার জে. এন. গুপ্তের রচিত সেই মেলমেলার পরিবেশটি চুরমার হয়ে গেল। বড় কর্মচারীরা বিভিন্ন স্থলে বদলি হন—মিস্টার গুপ্ত গেলেন রঙ্গপুরে। তিনি অবশ্য সেখানে আপনার উপযোগী বৃহৎ কর্মক্ষেত্রই পেলেন। কিন্তু নোয়াখালি শহরের গোলডেন এজ্, ফুরোল, সেই জীবন-চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে গেল। এল ব্যুরোক্রাট্‌দের বিচ্ছিন্ন দ্বৈপায়নী জীবন। অন্য দিকে মেঘনাও শহরের প্রান্ত গ্রাস করে একেবারে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে এল। বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত মেঘনার 'শরের' 'ডাকে' ও উচ্ছ্বাসে শহর কাঁপতে থাকে। সে বান, সে জোয়ার, সে জলোচ্ছ্বাস দৃশ্য হিসাবে একটা রুদ্র ভয়ঙ্কর আকর্ষণ—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষের। ভাদ্রের আমাবস্থায় স্কুল ছুটি হয়। কাছারি ভেঙে দিয়ে

কর্তৃপক্ষ এসে দাঁড়ান মেঘনার পাড়ে—বহুদূর থেকে দেখা যায় আকা পূর্ব-কোণে সমুদ্রের ফেন-রেখা, আধ ঘণ্টা পূর্ব থেকে তার গর্জন শোনা যা ক্রমে তা বাড়ে, ক্রমে তা এগিয়ে আসে। দুর্বার তার গতি, সর্বগ্রাসী শব্দ। তারপর অকস্মাৎ পূর্বের থাল পার হয়ে এ পাড়ের দিকে যখন দেখা দিল তখন চমকে উঠতে হয় তার রুদ্ররূপে—বুক দুড় দুড় করে পালাতে দেখেছি সভয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোক ও মহিলাদের তখন ছুটে বাড়ি দিকে। মুহূর্তমধ্যে সে শর প্রলয় গর্জনে সাম্‌নে দিয়ে ছুটে চলে গেল পশ্চি দিকে, পিছনে পিছনে এল পাঁচবাড়িয়ার জলোচ্ছ্বাস। তারপর পূর্ণ জোয় ফেঁপে কূলে কূলে ভরে উঠল নদী। দুপ্‌দাপ ভেঙে পড়তে লাগল পা হুড়মুড় করে হুড়মুড় খেয়ে ভেঙে পড়তে লাগল নদীগর্ভে ছোট বড় গাছ।

এই পরিবেশ দেখতে-দেখতে ভাঙন-মুখী শহরে আমার স্কুলজীবন শে হয়ে আসে ১৯১৮-তে। যে প্রাঙ্গনে আমি পদার্পণ করেছিলাম তার চেয়ে আমি চলে আসছিলাম ততদিনে পৃথিবীর দিকে। এই আট-ন বৎসরে বয়সের নিয়মে আমি বালক থেকে কিশোর হয়েছি আর কিশো থেকে হয়েছি তরুণ। দেহের হিসাবেও তা একটা মিরাকল্। কিন্তু এ শুধু দেহের হিসাব নয়, একটা মানসিক বিবর্তনেরও ইতিহাস। তার মধ্য আছে আরও একটা সত্যেরও জন্মকথা। এই পরিবার প্রাঙ্গন পরিবে সকলেরই মধ্যে যার জন্য প্রস্তুতি ছিল গোপনে-গোপনে লুক্কায়িত। আ এই দেশ-বিদেশ এবং এই ক্ষুদ্র নোয়াখালি শহরের আলো-আকাশ থে যা প্রাণবায়ু সঞ্চয় করে এনে শত শত বালকের মতো এই বালকেরও মন মধ্যে অঙ্কুরিত করল এক অদ্ভুত প্রকাশ—স্বাদেশীকতা ও সাহিত্যানুভূতি চৈতন্যের জন্মলাভ সেই তৃণাঙ্কুরের জন্মকথা।

(ক্রম

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

শীত শেষ হয়ে ক্ষণস্থায়ী বসন্ত গ্রীষ্মের সীমায় এসে হারিয়ে গেল। পতঝরি হাওয়া এসে একরাত্রে অশথ আমড়ার পাতা ঝরিয়ে ছড়িয়ে উড়িয়ে দিল। হাওয়ায় ধুলো—ধুলোয় উত্তাপ। বেঁটে ইট-বেরুনো পাচিলের কাছে মাদার গাছে ফুল ফুটেছে। দুপুর—প্রমত্ত গরম দুপুর—শালপাতা আর ধুলোর ঘুরপাক। রেস্তের্ঁার লোহার চেয়ারে মাছির মেলা। কর্মচারী ঘুমোচ্ছে। মালিক খেতে গেছে। দোকানপাট ঝিমন্ত। রেস্তোরঁার এক কোণে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শান্তনু বসে আছে। ফাঁকা ঘর। শান্তনু খদ্দের নয় কাজেই পাখা ঘুরছে না। দীর্ঘকাল সুব্রতর সঙ্গে দেখা হয় নি। দেখা করেনি বলাই ভালো। রুচি মাঝে একদিন এসেছিল। হয়তো রুচি চেয়েছিল শান্তনুর বিরূপতাকে ভাঙতে—যে আড়ালটা শান্তনু আর ওদের মধ্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে সেটাকে নিঃশেষে উড়িয়ে দিতে। শান্তনু কথা বলেছিল, কিন্তু মন থেকে সাড়া দেয়নি। রুচি ওদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করে আড়ষ্ট হয়ে বিদায় নিয়েছিল। শান্তনুর মেজবৌদি আর সেজবৌদি তারপর শান্তনুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রুচি এল, ভালো করে কথা বললে না যে? নিস্পৃহ গলায় শান্তনু মৃদু জবাব দিয়েছিল—ভালো লাগল না। এই উত্তরে উৎসাহিত হয়ে মেজবৌদি আর সেজবৌদি রুচির অস্থির স্বভাবের বিষয়ে পঞ্চমুখ হয়ে একটা মেয়ে মজলিস বসাতে চেয়েছিলেন। নানা মন্তব্যের পর শান্তনুকে উৎসাহিত করতে না পেরে মেজবৌদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—চুপ করে আছ যে? শান্তনু আবারও জবাব দিয়েছিল—ভালো লাগছে না। ভালো লাগছে না সত্যিই। জ্বরটা প্রায় আসে। শরীর অসম্ভব ক্লান্ত।

আর একদিন বাসের জানালা থেকে শান্তনু দেখেছিল সুব্রত রুপি পাড়ার মোড়ের বাঁকে মিলিয়ে গেল। শান্তনু সুব্রতকে দেখে কোনো আ অনুভব করল না। সে আজকের মতোই নিজেকে ছেড়ে দিয়েই বসেছি আজকের মতোই—এই অর্থহীন জনকল্লোলের তীরে আজ সে যেমন ব আছে—কারো প্রতীক্ষায় নয়, কারো উদ্দেশ্যে নয়—সেদিনও বাসে ব ঘোষপাড়া রোড ধরে সে নিরর্থক ছুটে চলেছিল কিছু পাবে বলে ন কারো সঙ্গে দেখা হবে বলে নয়। রেস্তোরাঁর ছেলেটা তিনখানা চেয়া এক জায়গায় করে ঘুমোতে ঘুমোতে মাছি তাড়াচ্ছে। শান্তনু ছেলেটা চেনে, ওর নাম বেণু। এই কদিন আগে ওকে দেখেছে স্কুলে। সতে আঠারো বছরের রিফ্যুজি ছেলে। আজকে দেখছে এখানে রেস্তোরাঁ বয় হিসাবে। ছেলেটা ওকে চেনে। কিন্তু বোধহয় আর কোনোদিন স্কুলে যাবে না। তাই শান্তনুকে ও আর গ্রাহ্য করল না। তাতে শান্তনু কোনো কষ্ট হল না। কেন গ্রাহ্য করবে ও? কাকে করবে?—শান্তনু জা বেণুরা আর কাউকেই গ্রাহ্য করবে না। ছেঁড়া গেঞ্জি আর খাঁকি হাফপ্যা পরা বেণুর মুখেচোখে এরই মধ্যে ইট-পাথর-নোংরা-ধুলোর বি, টি. রো ছাপ দিতে শুরু করেছে। বেণুর হাতটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মা বসতেই লাগল ওর মুখে। শান্তনুর মনে হল ও যেন বলতে চাইছে—মা তাড়িয়ে কোনো লাভ নেই, এত মাছি তাড়িয়ে ওঠা যাবে না। তার চে ঘুমোনো যাক। শান্তনু পারত না। এত মাছি উপেক্ষা করে ঘুমোনো সম্ভ নয়। এরা অগুণতি। অবাধ্য। কুরে কুরে খায় তার ঘুমকে, বিশ্রামকে একটা বছর সাতেকের কালো ছেলে, রাস্তায় মারামারি করছে। পাক কোঁকড়া চুল, মোটা ঠোঁট দেখলে মনে হয় ছেলেটা নিগ্রো। শান্তনু জা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছেলে—সেই সময়ের সন্তান, যখন ওহিও-র কোনো তুলাচাষী রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছিল পৃথিবীর বুকে—তখনকার। ও ছেলেটা নাম কালুয়া।

শান্তনু চুপ করে বসেই থাকে। ভাবে দেখতে দেখতে এই ছো জনপদের চেহারাটা কেমন পাল্টে গেল। যুদ্ধের আগের সেই নিরুদ্বেগ মফস্ব শহর কোথায় মিলিয়ে গেল। সকাল দুপুর সন্ধ্যায় চটকলের বাঁশী বাজত সেই সময়টুকুতে যা পাঁচমিশেলি শহরের রূপটা ধরা যেত রবিবার আ শুক্রবার—এত্‌ওয়ার আর হপ্তাবারে যা কিছু চনমনে ভাব দেখা দিয়েই মিলি

যেত। তা নইলে দুধারে মনসাসিজের বেড়া মাঝখানে খোয়া-বাঁধানো ধুলো কাদার রাস্তায় গোণাগুণতি লোক চলা দেখতে দেখতে ঘুম আসত। ক্লেদ ছিল না সে দিনের জীবনে তা নয়—কিন্তু এটা সত্যি যে, জটিলতা ছিল না। টিক্ টিক্ করে পেণ্ডুলাম দুলছে। পাতা ঝরছে পিচের রাস্তায়। দমকা হাওয়ায় শুখনো পাতার রাশি রাস্তায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। মার খেয়ে খ্যা খ্যা করে হাসছে কালুয়া। রাস্তায় একটা শিটি বাজাল কোন্ রকবাজ। আর শিটির শব্দ শেষ হতে না হতেই ধীর পায়ে একটি মেয়ে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল। শান্তনুকে দেখে মেয়েটি চমকে গিয়ে বোধহয় এক লহমার জন্য থমকে গেল। তার পরে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দোকানের মধ্যে এসে দাঁড়াল। শান্তনু চিনতে পারল মেয়েটিকে। মেয়েটি চিনতে চাইছে না, তবু শান্তনু জিজ্ঞাসা করল:

—তোমার নাম মমতা না?

—হ্যাঁ। বিষণ্ণ চোখ দুটোয় পরিচয়ের জন্য কোনো আগ্রহ নেই। যেন কথা বলতে হয় বলে বলা।

—তুমি আমায় চিনতে পাচ্ছ না?

—আপনাকে দেখেছি। ফটিকবাবুদের বাড়ি।

—এই রৌদ্রে কোথায় বেরিয়েছ?

—বাবাকে খুঁজতে।

শান্তনু বুঝতে পারছিল না যে মেয়েটি বিরক্ত হচ্ছে কিনা। ঝলঝলে ময়লা ফ্রক। রোগা, শির-বেরুনো হাত। চুপসে-যাওয়া মুখ। ফর্সা রঙ প্রায় শাদা হয়ে গেছে যেন। কোঁকড়া জট-পাকানো একরাশ চুল তেল পায়নি কতদিন। শান্তনু দেখল মেয়েটাকে যত বাচ্চা সেদিন ভেবেছিল তত বাচ্চা সে নয়। ফ্রক না পরলেই পারে। চোখের চাউনিতে এমন একটা অভিজ্ঞতার ছাপ মোটেই মানাচ্ছে না। সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে শান্তনুর আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না। ওর মনে হল মেয়েটি ভয়ানক ক্লান্ত। আর ক্লান্ত বলেই বোধ হয় ও একটা ভয়াবহ ঔদাস্যে ভুগছে। এ কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তনুর নিজের বিষণ্ণতাও যেন আবার দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল।

মমতা শান্তনুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলার কোনো চেষ্টাই করল না। ও এগিয়ে গেল বেণুর দিকে। যে বেণু মাছি উপেক্ষা করে ঘুমোচ্ছিল সে

কিন্তু মমতার এক ডাকেই উঠে পড়ল। চোখ রগড়ে মমতাকে বলল—মমতা, এঃ ঘেমে গেছ যে। বলেই পাখাটা খুলে দিল। একটা চেয়ার ঝেড়ে দিল। মমতা বলল—বেণু বাবা এসেছিলেন ?

বেণু জানাল, না তিনি আসেন নি আজ।

মমতা আপন মনে নিচু গলায় কী যেন বলল। একবার বাইরের রোদের দিকে তাকাল। তারপর কারো দিকে না তাকিয়ে আবার রাস্তায় নেমে গেল। বেণু চেঁচিয়ে বলল—এলে আমি খবর দোব তোমায়।

মমতা চলে গেলে পাখাটা বন্ধ করে বেণু শান্তনুর দিকে তাকাল। তারপর নিজে থেকেই বলল—ওর বাবা মাঝে মাঝে বেপাত্তা হয়ে যান। কোনো দিন দুপুরে, কোনো দিন বা অনেক রাতে এখানে এসে বসেন।

হঠাৎ কথার খেই ছেড়ে দিয়ে বেণু বলল—মদে চুর হয়ে থাকেন তিনি, চব্বিশ ঘণ্টাই বলা যেতে পারে। মমতা আমাকে বলে রেখেছে এখানে ওঁর বাবা এলে আমি যেন ওকে খবর দিই।

এই দোকানটাই বা কত বদলেছে। ড্রিকিং অফ লিকার প্রোহিবিটেড লেখা সেই বোর্ডখানি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মমতার বাবা অথবা অন্য অনেকেই এখন ইচ্ছেমতো দোকানের পিছন দিকটায় বসে খেতে পারেন।

বেণু ঘুম ছেড়ে উঠে পড়ল। চোখেমুখে জল দিতে গেল। শান্তনু দেখল ম্যাটিনির ভিড় জমছে রাস্তায়। রিকসার ভেঁপু বাজছে ঘন ঘন। স্টেশনে দুদিক থেকে আপ ডাউনের গাড়ি এল। রেস্তোরাঁ দেখতে দেখতে ভরে গেল। চৌকো খুপরিগুলোর পর্দা সরিয়ে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেরা মেয়েরা ঢুকে পড়ল। একটা হাসিখুশি মেয়ে আর একটা লম্বা ছিপছিপে সটান চেহারার ছেলেকে দেখে শান্তনুর হঠাৎ মনে হল এরা সুখে আছে। হয়তো এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই এখনো। হয়তো কোনোদিন সম্পর্ক হবে। এরা সুখে আছে। ইচ্ছে করলেই সুখে থাকা যায় ? পারি না কেন তা হলে ? আমার ভাবতে পারার ক্ষমতাই আমাকে নির্বাসনে ফেলে রেখেছে। ক্লান্ত ঘোলাটে চিন্তায় নিজেকে আবার জরো রুগীর মতো মনে হতে লাগল। "কী বই" ? "ফল অব বার্লিন", "এন. কে. সির ক্লাস ফাঁকা করে সবাই চলে এলি ?" "দূর কী হবে মাথায় কিছু ঢুকবে না আজ"। শান্তনু শুনল সব। চলে যাব সিনেমায় ? পকেটে হাত দিয়ে দেখল হয়ে যাবে পয়সায়। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখল কত চেনা লোক। ওইখান

থেকেই দেখতে পেল সুব্রত আর রুচি যাচ্ছে। রুচির হাতে বইখাতা। শান্তনু স্থির করে ফেলল, থাক, যাব না। সুব্রত এদিকে দু-বার তাকাল। শান্তনুকে দেখতে পায়নি ও।

আবার দেখতে দেখতে রেস্তোরাঁ ফাঁকা। রাস্তার গোলমাল থিতিয়ে গেল। একটা কোণে দেওয়ালের দিকে মুখ করে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন তিনি বসেই রইলেন। ময়লা ছেঁড়া পাঞ্জাবীতে তরকারীর দাগ—তালি দেওয়া জুতো—মাথার চুলগুলো কাঁচা পাকায় মেশানো—মুখখানা অস্বাভাবিক লাল এবং থমথমে। বেণু অন্য দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। ভদ্রলোককে দেখে চমকে গেল ও। কাছে গেল। ডাকল—কাকাবাবু।

ভদ্রলোক সাড়া দিলেন না। বেণুর দিকে মুখ ফিরিয়ে ভালো করে তাকাবার চেষ্টা করলেন। কী যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু মুখের কাছ থেকে কথাটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার যেন বুকের মধ্যেই ডুবিয়ে দিলেন। এই কথা এইভাবে ভাবতে ভাবতেই শান্তনু তাকাল ভদ্রলোকের বুকের দিকে। রোমশ বিশাল বুক।

বেণু আবার ডাকল—কাকাবাবু, মমতা এসেছিল।

ভদ্রলোক আবার তাকালেন। শান্তনুর মনে হল এ শুধু তাকানো মাত্র, এতে কোনো দৃষ্টি নেই।

বেণু গায়ে হাত দিয়ে ডাকল—বাড়ি চলুন! বেণু বুঝল কাকাবাবুর ওঠবার হাঁটবার ক্ষমতা নেই। শান্তনু দূর থেকেই বুঝতে পারছিল ভদ্রলোক ভদ্রলোকের মধ্যে আর নেই। বেণু নিরুপায় হয়ে শান্তনুকে জিজ্ঞাসা করল—কী করি বলুন তো ?

শান্তনু বলল—তুমি ওঁকে বাড়ি পৌছে দাও।

—দোকান ছেড়ে আমি কী করে যাব ? মালিক আসেনি এখনও যে।

—মেয়েটিকে খবর দাও না ?

—সে কি একা এঁকে নিয়ে যেতে পারবে ? তা ছাড়া মমতাকে দেখলে উনি মারধোর করেন, বিশেষ এ সময়ে।

—তাহলে ওঁর বাড়ি যাবার দরকারটা কী ? থাকুন না যেমন আছেন। তুমি বরং ওঁকে দোকান থেকে অন্য কোথাও যেতে বল।

—সে বললে মমতা শুনবে কেন ? তাঁর বাবা তো বটে।

কী করা যায়, কী বা বলাই যায় শান্তনু বুঝতে পারল না। বেণু একটু

ত্রস্ত হয়ে পড়ল। মালিক এলে ওকে কথা শুনতে হবে। ওদিকে ভদ্রলো বেহুঁস। মাছি বসছে ভদ্রলোকের মুখে। হাত নেড়ে মাছি তাড়া চাইলেন। হাতটা কাঁপছে। ফর্সা হাত, ময়লা-জমা নীল নখ, পাঞ্জা হাতায় কাদা। মাথাটা দু-হাতে চেপে স্থির রাখার চেষ্টা করে করে শে মাথাটাকে ছেড়ে দিলেন সামনের টেবিলে। বেণু বিব্রত মুখে শান্তনুর দি তাকাল—কী করি বলুন তো?

—অন্যদিন কী করো?

—অন্যদিন তো এত বেতাল হন্ না। আর হতে করতে নেশা ছুটে যা নিজেই আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যান।

এই কথা বলতে উদ্‌ভ্রান্ত মমতা নিজেই আবার এসে হাজির হল। 'বে বলে ডেকে মমতা ঘরের মধ্যে ঢুকল, তারপরেই 'বাবা' বলে এগিয়ে গে ভদ্রলোকের দিকে। মমতা বাবার দু-কাঁধের ওপর দু-হাত রেখে বাবা হুঁস ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল। অসীম উৎকণ্ঠায় মমতার মুখখানা টুলটু করে উঠল। শান্তনু ভাবল মেয়েটিকে সাহায্য করা দরকার। সে উঠ যেই এগিয়ে যাবে সেই মুহূর্তে ভদ্রলোক—'ছেড়ে দে খানকির বাচ্ছা' বলে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মেয়ের গালে জোরে এক-ঘা মেরে বসলেন বেণু বলে উঠল ইস্। হয়তো শান্তনুর চোখ জলে উঠে থাকবে। মমতা ত দেখেই বাবার মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরল। শান্তনুর ক্রোধ তা দেখে নিভে গেল। মমতা কাঁদছিল বটে—কিন্তু সে কান্না আঘাতের কান্না নয়। তা বাবা এমন হয়ে গেছে এই ক্ষোভের কান্না সেটা। দু-বার ফুঁপিয়ে বলে উঠল—বাবা, বাবা।

ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে দোকানের বাইরে। মজা দেখার ও মন্তব্য করার জন্য সকলে ঠেলাঠেলি করছে। রসালো মন্তব্যের এক আধটা মমতা দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ। "সেই মেয়েটা রে"—"সেই ফোঁস কেউটে"—"এ যে বাবা কাঠামো স্রেফ, একমেটে দোমেটে কিস্যু হয় নি"—মমতা বাবা আর একবার চেঁচিয়ে উঠলেন। ভিড় বলল—"অত জোরে নয়, ইসপিরি কেটে যাবে দাদা।" আর কাঁদল না মমতা, ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আত্ম হল। কান্না সামলাল। তাকাল ভিড়ের দিকে একবার, একবার ওর বাবার দিকে এখনো ছেলেমানুষের মতো কোমল ওর চিবুক—কপালে আর সুদীর্ঘ ভ্রূ-দুটো কেমন যেন তিক্ততা, ক্লান্তি—যেন অনেক কিছু জানে ও, যা জানতে চায় নি।

—চলো আমি তোমার সঙ্গে যাই। শান্তনু না বলে পারল না। উঠে গিয়ে কাছে দাঁড়াল।

—না, থাক। অবাধ্যের মতো ঘাড় বেঁকাল মমতা। একটু যেন রুক্ষ ওর গলা।

—তুমি একা পারবে না।

—বেণু তুমি চল। মমতা শান্তনুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। বেণু দেখল মমতার মুখ লাল। বেণু একবার বাইরের দিকে তাকাল, ওর মালিক আসার সময় হল।

—আমি কী করে যাব মমতা, মালিক এসে পড়বে এখুনি, বিকেলে বেচাকেনার সময়।

—একটা রিক্সা ডেকে তুলে দাও বাবাকে, দেখ যোগেশ আছে কিনা, তাহলেই হবে, আমি একাই পারব।

—যোগেশ কোথা, সে হাঁসপাতালে গেছে, ওর ভাগনের অসুখ।

শান্তনু বলল—বেণু, তুমি একটা রিক্সা ডাক। চল মমতা—কী আর করবে? এই ভিড়ের হাত থেকে তো রেহাই পাবে। মমতা বললে—চলুন, কিন্তু একটা কথা, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। তার পর যেন স্বগতোক্তি করল—আমার ভালো করতে হবে না কাউকে।

বেশি দূরে নয়, কাছেই একটা পুরনো গলির মধ্যে এখন মমতার বাবা বাসা করেছেন। একতলার বাইরের দিকের একটা অংশে ওরা থাকে। সে ঘরের দেওয়ালে শ্যাওলার দাগ, বিছানায় চাদর নেই, জানলার পাল্লা ভাঙা। আলনায় স্তূপীকৃত ময়লা কাপড়। দিনের বেলাতেও মশা পন্ পন্ করছে। একটা বিবর্ণ স্টোভ তেলঝুল মেখে পড়ে আছে এক দিকে। কুলুঙ্গিতে একটা অন্ধ দর্পণ। অন্ধ দর্পণ—কথাটাই শান্তনুর মনে হল। মমতা নিশ্চয় নিজেকে দেখে না—কোনোদিন না। এ নিজেকে ঢেকে রেখেছে—মমতার মতোই এও ক্লান্ত। এই ঘরের ধোঁয়া কালি লেগে রয়েছে এর বুকে।

—মমতা।

—আর কিছু করতে হবে না। এবার আপনি—

—এখানেই শুয়ে থাকবেন ইনি?

—হ্যাঁ।

—তারপর ?

—অনেক রাত্রে ওঁর ক্ষিদে পাবে, তখন একেবারে অন্যমানুষ হয়ে যা বলবেন—মমতা কী খাব ?

—তখন মনে থাকবে না যে তোমাকে—

—মেরেছেন যে সে কথা ? না। সে কথা মনে থাকবে না।

—আশ্চর্য তো।

—উনি আমাকে মারেন না।

—মানে কী তোমার কথার ?

হঠাৎ চুপ করে গেল মমতা। বাবাকে বাড়ি আনা হয়েছে, নির্বি শোয়ানো হয়েছে এই খুশিতে ও একটু বেশি কথা বলে ফেলেছিল। শান্ত জিজ্ঞাসার খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেল। শান্তনু বলল—

—ঠিক আছে। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না। আমি যা তাহলে ?

—যাবেন ?

—যাই। একটা কথা শুধু জানা দরকার। তোমার বাবা খেতে চাইবে খানিক বাদে, খাবার ব্যবস্থা সব আছে।

—হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা আছে। শুধু স্টোভে হাতটা পুড়ে গেছে কাল, এই অসুবিধে।

—তাহলে ?

—আপনি বরং যাবার সময় বেণুকে একটু বলে যাবেন। ও নিয়ে আস খাবার।

—ও তোমার কেউ হয় ?

—না তবে ও খুব ভালো। আর সকলে গল্প শুনতে চায়, আর—

—আর ?

—কিছু না। দোকানের খদ্দেররা মদ কিনতে দিলে বেণু সেই ছুতো চলে আসে একবার। আমার কিছু দরকার থাকলে ওকে বলি।

বেণুকে শান্তনুর ঈর্ষা হল। বেণু স্কুল ছেড়ে রেস্তোরাঁর বয় হয়েছে— এতেই সে ব্যর্থ হয়ে যায় নি। ও কোথাও কাজে লাগে। কেউ একজ ওকে বিশ্বাস করে। যত সামান্যই হোক বেণু একটা কিছু করে যার একটা মানে আছে। আর শান্তনুর নিজের ?

বিকেল হয়ে এল। পড়ন্ত রোদ পলস্তারা-খসা পাঁচিলের অশথ চারার মাথায় তির তির করে কেঁপে গেল। একটা না-খেতে-পাওয়া বিড়াল তারই তলায় বসে খানিকক্ষণ কাঁদল—শালিখের নিবিষ্ট ঠোঁট ডানার পালক সাফ করছে দেখে বিড়ালটার অক্ষমের লোভ যে না হল তা নয়। কিন্তু সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত বিড়ালটি তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না। কাঁচা রাস্তার ধুলোর ওপরে এক ঝলক থুতু ছিটিয়ে শান্তনু বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল। পথে চানাচুরওয়ালা লাল টুপী পরে পায়ে ঘুঙুর লাগিয়ে নেচে নেচে ছড়া বলছে। একটা এলুমিনিয়ম শপে বিকেলের শেষ রোদ শেষবারের মতো ঝলসে উঠছে। দূরে পশ্চিমের কাটা-কাটা মেঘে রংরেজিনীর হোলি। বারো হাত কার বেচে যে-লোকটা সে মস্ত বড় লগাটাকে জয়ধ্বজার মতো ধরে রেখেছে—হামাগুড়ি দিয়ে যে-ভিখিরীটা ভিক্ষা করে প্রাণপণে মাথা উঁচু করে সে গালাগাল দিচ্ছে বিকেল—নরম হয়ে এসেছে আলো, ধুলো, আর হাওয়া। বিকেল— অথৈ ভিড় নেমেছে পথে। তিনটে বেওয়ারিশ কুকুর এ ওর ল্যাজ কামড়ে খেলা করছে, ধুলো মাখছে পরম খুশিতে। বৃহৎকায় বপু ধর্মের ষাঁড় তদ্গত হয়ে জাবর কাটছে। হঠাৎ অনেকদিন বাদে শান্তনুর ভাল লাগল।

বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে শান্তনু পাড়ার মধ্যে ঢুকল। মেয়েরা ছাদে ছাদে গল্প করছে। ছেলেরা খেলা করছে রাস্তায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মা ডাকছে ছেলেকে। ছায়া-নেমে-আসা ঠাণ্ডা রকে বসে তিন বুড়ো দাবা পেড়েছে। একজন একটা মাঝারি গোছের মাছের কানকো ধরে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাঁচজনে তার দর জিজ্ঞাসা করছে। বেণুকে বলে এসেছে মমতার কথা। বেণুর চোয়াড়ে চিবুক নরম হয়ে গিয়েছিল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল। কোথায় যাবে এখন—এখন কোথাও যাবার নেই। রুচির ওখানে যাবে ?—না, কী হবে ? ঘুরে-ঘুরে, ঘুরে-ঘুরে, ঘুরে-ঘুরে যখন আর হাঁটতে পারল না তখন, তখনই ও ফিরে গেল। তখন অনেক রাত।

সেদিন রাত্রে নিজের ছোট ঘরখানায় শুয়ে শুয়ে মৌন নিশীথিনীর হৃৎস্পন্দনই সে যেন শুনছিল বালিশে মাথা রেখে। শহর ঘুমে চুপ। বাইরে পাতা ঝরার শব্দ। মাঝে মাঝে, বেশি দূরে নয় রেল লাইনের ওপর দিয়ে হু হু করে ঝড়ের মতো মালগাড়ি পাশ করে যাচ্ছে। নিজেকে ঘিরে ঘিরে শান্তনু ঘুরতে লাগল। পুরনো রেকর্ডের ফাটা জায়গায় পিন লাগলে যেমন

একই কথা বারে বারে বেজে চলে, শান্তনুও ঠিক সেই ভাবে পুরনো কথা বলে চলল আপন মনে। ভাবল সুব্রতর কথা। রুচির কথা। সুব্রত রুচিকে চুমু খায় সুব্রতর কি কিছু মনে পড়বে? রুচির? রুচি কত যেতে পারে? রুচির বাবা মা? অকারণেই ছেলেমানুষের মতো এক তুলনা করে বসল শান্তনু। মমতা আর রুচির মধ্যে কে বেশি জীবনের কাছে বসে আছে? কে পুড়েছে বেশি?

ভুলি কেন? কে ভোলায়? সময়কে কে দেয় তৃণ গুচ্ছ দিয়ে পায়ে-চলা পথ ঢেকে দেবার সুযোগ? এইসব অকারণ চিন্তার গোলক-ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে বিকেলের মতোই আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল শান্তনু। তার পরে ঘুমিয়ে পড়ল। ও জানতে পারল না বাইরে অঢেল পাতা ঝরে গেল। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে কলকাতার দিক থেকে হাওয়া আসছে—কলকাতায় সে হাওয়া আসছে বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে। অনেক রাত্রের এই হাওয়ায় সমুদ্রের স্বাদ। শান্তনুর শ্রান্ত কপালে সেই হাওয়া হাত রেখে গেল। শান্তনু জানল না। অনেক পাতা-ঝরে-যাওয়া অশথ গাছটায় শেষ রাতে একটা কোকিল ডেকে উঠল। সে কথাও শান্তনু জানল না। এই কোকিলটা এখন ডাকতেই থাকবে। এ ওর অভ্যাস। আর কিছু নয়। তারপর কিছুক্ষণ বাদে বি. টি. রোডের ট্রাফিক কল্লোল চড়া সুরের চূড়ান্তে পৌঁছে গেলে হয় কোকিলটা উড়ে পালাবে। আর নয় ওর ডাক হারিয়ে যাবে। ও থাকবে, কিন্তু শোনা যাবে না ওর ডাক।

শেষ রাত্রে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল ওর। ঘুমের ঘোরে ও তাও জানতে পারল না।

(ক্রমশ)

গ্যোটের "আইন গ্লাইখেস" থেকে

একই রকম

সকল শৈলশিখর পেল
শান্তি,
সকল তরুর চূড়ায় এল
শান্তি,
শুনবে নাকো বায়ুর কোথাও
স্বনন,
নেইকো বনে পাখির কোথাও
কূজন,
নেইকো দেরি, একটু জিরাও,
তুমিও পাবে শান্তির চির
শয়ন।

মূল জর্মন থেকে অনুবাদ : কানাইলাল গাঙ্গুলী

[১৭৮০ সালে শরৎকালে, অর্থাৎ ৩১ বৎসর বয়সে "ভাইমের"-এর নিকটবর্তী "ইল্‌মেনাও"-এর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গ্যোতে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, সেই সময় ঐ চূড়ার কাঠের বাড়ির দেওয়ালে এই কবিতা লিখেছিলেন। তার প্রায় ৫১ বৎসর পরে, অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে, পুত্রশোকসন্তপ্ত হয়ে উনি দুই নাতিকে নিয়ে এই পাহাড়ের চূড়ায় দ্বিতীয়বার ওঠেন, আর দেওয়ালে এই কবিতা কাঠের উপর লেখা রয়েছে দেখেন। এর দ্বারা তখন তিনি অতিশয় অভিভূত হন। অনুভব করলেন এ যেন তাঁর তখনো অকবরিত মৃত পুত্রের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, আর হয়তো তা নিজেরও অনতিদূরে তিরোভাবের ইঙ্গিত তাঁর কাছে বহন করল।—অনুবাদক]

কৃষ্ণ ধর

ভবিষ্যৎ অন্তরীণ, সত্তা শুধু অস্থির দর্শক

প্রতীকের ঘরবাড়ি, স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করে
যারা থাকে নির্মল ফুলের জন্য সাজানো বাগানে
হঠাৎ প্রখর হলে হাওয়া
সর্বনাশ
ঘর ভাঙে, স্বপ্নের ঠোঁটে বসে মাছি
সব মরে, কিছুই থাকে না
শুধু সর্বনাশ
আগুনের বেড়া চারদিকে,
নিষ্ঠুর আগুন
কিছুই থাকে না, থাকে না কিছুই
স্মৃতি নষ্ট হলে, ধুলো মেখে উঠোনে গড়ালে
বড় কষ্ট হয়, বড় অসম্মান
তার চেয়ে বেশি দুঃখ বিপন্ন সময়ে
দুঃখ ছাড়া আমাদের আর কোনো সম্বল থাকে না
কবিতার ভাষা নয়, দেখ চেয়ে উদ্ধত ঘাতক
উপস্থিত, হত্যা করে, নষ্ট করে, ছিন্নভিন্ন করে
ঘরবাড়ি, ভবনশিখির পুচ্ছ,
স্নেহ ও মমতা, প্রতীকের, স্বপ্নের অথবা প্রেমের
প্রয়োজন ধুলোতে ফুরোয়
সর্বনাশ গ্রাস করে সমস্ত বিস্ময়
ভবিষ্যৎ অন্তরীণ, সত্তা শুধু অস্থির দর্শক ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

গত শুক্রবার খুলনা
কলকাতা বৃহস্পতিবার

মূলত শ্বাপদবৃন্দ অনায়াসে মুখ দেখাতে পারে,
কিন্তু না, জন্তুর নাম করবো না, জন্তুরা এখন
মানুষ পদবী নিলে ক্ষতি নেই, সম্ভবত আজ
রাস্তার কুকুরগুলো ঢের বেশি ভালোবাসতে পারে,
তাদের প্রেমিক নাম দিলে সৃষ্টি উচ্ছন্নে যাবে না ;
কিন্তু যারা—ভাড়াটে যে সব গুণ্ডা—নিরীহ সরল
অন্ধ আতুর খঞ্জ রমেশ রহিম আহ্‌সান
সুহাসের কুঁড়েঘরে আগুন ধরিয়ে তীর্থসম
গোয়ালপাড়ার পথে নারীমেধ শিশুমেধ সেরে
মৃত নারীদের দেহে প্রবৃত্ত হয়েছে, ভাড়াটিয়া
যে সব দালাল গুণ্ডা মানুষের পুণ্যনাম নষ্ট করে গেল,
মকুফ করবে নাকি বসোরা-গোলাপ মহম্মদ ?
তুমি কি নতুন করে নাম রাখতে নরকের নাম
'ধরণী' দেবে না ?   আর ধরণীর নাম রসাতল ?
ভ্রূণমুকুলের মধ্যে আত্মঘাতী শিশুরা ব্যতীত
মানুষ রয়েছে নাকি, গন্ধরাজ-ঈশ্বর আমার ?

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

উপহার

চাও কোন উপহার ? কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন আমি,
বিপর্যস্ত, পরিত্যক্ত, ভগ্নউরু অসংগত রণে।
শুনি ঘোর কলরোলে কালনদী ধায় দিবাযামী
অমোঘ অরোধ্য বেগে। ধ্বংসের দারুণ আলিঙ্গনে
আমার নিষ্কৃতি নেই। নির্মূল দম্ভের মহীরুহ ;
আশা, স্বপ্ন ধূলিসাৎ ; ছিন্নভিন্ন অপ্রধৃষ্য সেনা ;
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ হত ; চারপাশে প্রেতাত্মার ব্যূহ।
স্বজন বন্ধুর রক্তে মিটিয়েছি এ-জন্মের দেনা।

তোমায় কী দিতে পারি ? চাই কি দুর্মূল্য আভরণ ?
খুলে দেব রাজকোষ ? হীরা রত্ন স্বর্ণ ভারা ভারা ?
রাজত্ব আমার ? হায় ! ভবিতব্য করাল ভীষণ।
আজ আমি দুর্যোধন ধরাশায়ী, রিক্ত, সর্বহারা।

কিছু নেই, এমন-কি কোনও অনুতাপ, পরিবাদ ;—
যা আছে তা শুধু এই বুকে-ধরা ঠাণ্ডা মরা চাঁদ ॥

বিকাশ দাশ

রক্তের পল্বলে ভাসে

আমরা কেউ সুখী নয়,—না তুমি, না আমি কোনোজন,
অথচ সুখের খোঁজে কাটালাম হাজার বছর।
সুখ যেন দূরগামী মায়াবী হরিণ অনুক্ষণ,
ক্রুদ্ধ সাইক্লোনে ওড়ে পাখি, খড়কুটো, বাড়িঘর !
বিষাদে আচ্ছন্ন গ্রাম, জনপদে হিংসা-দ্বেষ, চতুর ছোবল
সাপের মতন হেনে আরো দ্রুত মসৃণ মুখোসে
ঢেকেছি সমস্ত মুখ। প্রতারণা—অবিবেকী নিপুণ কৌশল,
নিজেরি চাতুর্যে নিজে মুগ্ধ, লুটোপুটি খাই হেসে।

অসাড় চেতনা, নেই প্রত্যয়—সংশয় চারিদিকে,
সৌজন্য, বন্ধুত্ব, দয়া, স্নিগ্ধ অকলুষ ভালোবাসা
অপস্রিয়মান, এই রক্তাক্ত সময়ে আছি টিকে,—
কী করে হৃদয়ে তবু ধ্রুব উত্তরণের প্রত্যাশা
এখনো রেখেছি পুষে ? অপ্রেমে, নৈরাজ্যে, অন্ধতায়,
পৃথিবী আচ্ছন্ন, প্রেম রক্তের পল্বলে ভেসে যায় !

বাসুদেব দেব

সময়ের চতুর কোকিল

সময়ের চতুর কোকিল কখনো বা জেগে ওঠে উষ্ণ বাতাসের
করস্পর্শে। তখন আমার বড়ো ভয়
বড়ো ভয় করে। বিশেষত
কৃষ্ণচূড়া শোভিত আকাশ
যখন পতাকা হয়ে নাচে।
লুণ্ঠনকারীকে বড়ো ভয় করি,
সর্বত্রই রাহাজানি সচল, সচ্ছল।
সময়ের চতুর কোকিল মেঘের স্তবক থেকে কখনো হঠাৎ
জেগে ওঠে বহুকাল পরে, রক্তে
হিম কুম্ভকর্ণ মরে গেলে। মনে পড়ে যায় ঐ হাওয়ায় ও
নিসর্গের কশাঘাতে: আমারও সাম্রাজ্য ছিল, অতুল বৈভব,
লাবণ্যপ্লাবিত অন্তপুর······
মুহূর্তে অপরিতৃপ্তি-বিষে নীল তনু,
পরিতাপে জ্বলি।
সময়ের চতুর কোকিল জানি আবার মাথায় পায়ে
কাঠি বদলে, ঘুম পাড়িয়ে যাবে।
তাই এই ক্ষণিকের জাগরণ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদিকে ভয়,
বিশেষত জানা নেই পুষ্পিত কুঞ্জের শেষে কোন্‌খানে আছে
স্বখাত সলিল পদ্ম পাতায় আবৃত।
লুণ্ঠনকারীরা সব চলে গেলে রিক্ততার ধুলো চতুর্দিকে,
অসহায় মনে হয় রক্ত মাংস চেতনা কামনা ইত্যাদিকে,
পুনর্জন্মে বিশ্বাস শিথিল॥

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা

চরিত্রলিপি ঃ

উইল শেক্সপীয়র	কিট মার্লো
অ্যান্ হ্যাথাওয়ে	সেক্রেটারী
মিসিজ হ্যাথাওয়ে	স্টেজ বয়
রাণী এলিজাবেথ	স্টেজ হ্যাণ্ড
মেরী ফিটন	পরিচারিকা (রাণীর)
হেন্‌স্‌লো	ভৃত্য (রাণীর)
সরাইওয়ালা	হিউ (বালক ভৃত্য)

অভিনেতৃবর্গ···মাতালগণ···ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক :

স্ট্র্যাটফোর্ডে শেক্সপীয়রের বাড়ির একটি ঘর।

দ্বিতীয় অঙ্ক :

প্রথম দৃশ্য—প্রাসাদ সংলগ্ন একটি ঘর—দশ বছর পরে।
দ্বিতীয় দৃশ্য—থিয়েটার হাউসের অফিস ঘর—তিন মাস পরে।

তৃতীয় অঙ্ক :

প্রথম দৃশ্য—লণ্ডনে শেক্সপীয়রের বাড়ির একটি ঘর—এক মাস পরে।
দ্বিতীয় দৃশ্য—ডেপ্টফোর্ডে সরাইখানার একটি ছোট ঘর—সেই রাতে।

চতুর্থ অঙ্ক :

প্রাসাদ সংলগ্ন একটি ঘর—পরের দিন।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[পর্দা উঠছে—ষোড়শ শতকের মধ্যবিত্ত বাড়ির ঘর। দেওয়াল ও ছাদ কালো শাল কাঠের তৈরি, তার ওপর সাদা চুনকামের প্লাস্টার। বাঁদিকে খোলা ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। তার

Clemence Dane-এর কাব্যনাট্য; "Will Shakespeare; An Invention in Four Acts" অবলম্বনে রচিত।

পেছনে দরজা। স্টেজের ঠিক মাঝখানে পেছন দিকে আধ-খোলা জানলা, তার ভেতর দিয়ে বাগানের বেড়া দেখা যাচ্ছে এবং দূরে শীতের আকাশ। ডানদিকে একটা সিঁড়ি উঠে ভেতর দিকে চলে গেছে। সিঁড়ির পাশে ফ্রন্ট স্টেজে লেখার টেবিল, তাতে কাগজপত্র জড়ো করা। দোয়াত-কালি এবং স্যাণ্ড বক্স। সিঁড়ির পাশে দেওয়ালে একটা বুকশেল্‌ফ ও তাতে কয়েকটি বই। শেক্সপীয়র লেখার টেবিলে কাগজের ওপর কনুই রেখে দু-হাতের মাঝখানে মাথা গুঁজে নিবিষ্ট হয়ে বসে আছে। ওর বয়স কুড়ি, কিন্তু দেখায় অনেক বড়, রং শ্যামলা, চেহারা কৃশ, কণ্ঠস্বর নীচু কিন্তু পরিষ্কার। ওর পেছনে অ্যান হ্যাথাওয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে—স্টেজের মাঝখানের বড় টেবিলে খাবার সাজানো। রুগ্ন চেহারা, পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ, লাল চুল; কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি, কিন্তু সহজেই চীৎকারে পরিণত হয়।]

অ্যান্‌ : (ইতস্তত করে, কথার মাঝখানে অল্প সময় দিয়ে) উইল, খাবার দেওয়া হয়েছে! উইল, শুনতে পাচ্ছ? জান…মা আজ কো থেকে একটা স্কাইলার্ক পাখি ধরে নিয়ে এসেছে…খাঁচার ভেত রেখেছি তো—কী চীৎকারটাই করছে! আজ সকালে কোথা গিয়েছিলে?—অনেক দূর?—তোমার পা ভিজে গেছে? নিশ্চ তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে…আজকাল সন্ধ্যে থেকে কি রকম ঠা পড়ে—আচ্ছা আমি কথা বললে উত্তর দাও না কেন?

[শেক্সপীয়র তাড়াতাড়ি উঠে যেতে থাকে]

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

শেক্স : বাইরে!

অ্যান্‌ : কোথায়?

শেক্স : যেখানে হোক্‌—

অ্যান্‌ : আমার কাছ থেকে যেখানে হোক্‌! তাই না? বল, তাই ন

শেক্স : (দাঁতে দাঁত চেপে) ঈশ্বর আমাকে ধৈর্যের শক্তি দাও!

অ্যান্‌ : ফিরে এস, উইল! ফিরে এস…আমার অন্যায় হয়ে গেছে ফিরে এস।…আমি বড্ড কথা বলি…জানি তুমি চটে গেছ ফিরে এস…তুমি তো জান আমি কিছু খারাপ ভেবে বলি নি খেয়ে যাও লক্ষ্মীটি!

শেক্স : আমি জানি।

অ্যান্‌ : তবে! এস খেয়ে নাও, আর—আর—আমার সঙ্গে একটু কথা বল।

[শেক্সপীয়র লেখার টেবিলে ফিরে যায়]

আবার লিখবে বুঝি? আজ কি লিখছ?

[শেক্সপীয়রের মুখে বিরক্তি]

বল…আমাকে বল উইল!

শেক্স : না!

অ্যান্‌ : আমাকে তোমার স্বপ্নের জগতে নিয়ে যাও!

শেক্স : অ্যান্‌, স্বপ্ন এক রঙীন বুদ্‌বুদ—তার সৌন্দর্যের রহস্যের ঠিকানা নেই—ব্যাকুল হয়ে ঐ বুদ্‌বুদকে তুমি ধরতে যাও—হাতই শুধু ভিজবে, স্বপ্নের জগৎ কোথায় মিলিয়ে যাবে!

অ্যান্‌ : আমাকে তোমার কল্পলোকের পথ দেখাও!

শেক্স : আমিই কি জানি সেই কল্পলোকের ঠিকানা? কোনোদিন… হয়তো কোনোদিন—

অ্যান্‌ : এক্ষুনি!

শেক্স : এখনও সময় হয় নি।

অ্যান্‌ : এক্ষুনি, এক্ষুনি!

শেক্স : তুমি জান, আমি পারি না!

অ্যান্‌ : পার না, না চাও না! চিরকাল তুমি দরজার বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে!

শেক্স : আমাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন?

অ্যান্‌ : কেন? চারমাস।

শেক্স : তুমি কি সুখী হয়েছ?

অ্যান্‌ : আমি সুখী,…হ্যাঁ, আমি সুখী…আমি সুখী! (হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে) আমি কেমন করে সুখী হব যখন তোমার চোখে সর্বনাশের কালো ছায়া দেখি! রাতে যখন তোমার পাশে শুয়ে প্রহর গুনি আর অনাগতকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনি তখন হঠাৎ তোমার হৃৎস্পন্দন শুনে আমার চমক লাগে—মনে হয় জীবনের বোঝা তোমার কাছে কত ভারী, ক্লান্তিতে তোমার দম আটকে আসছে! আমার মনটা ছটফট করতে থাকে—কেমন করে তোমায় সাহায্য

করব! আর তুমি···তুমি তখন পাশ ফিরে শোও। জানতে পার না তোমার বেদনায় আমার রাত অতন্দ্র হয়ে ওঠে। তুমি জানো না আমি কত আকুল হয়ে তোমায় সাহায্য করতে চাই।

শেক্স : কে জানে, হয়তো তুমি আমায় সাহায্য করতে পারতে। কিন্তু আমিত তোমায় জানি—তুমি আমায় সাহায্য করবে—নিজের পথে।

অ্যান্ : সেইটেই কি ঠিক পথ নয়?

শেক্স : আমি তোমায় বলেছিলাম না—নিজের পথে?—ছেড়ে দাও, সব চেষ্টা বৃথা।

[শেক্সপীয়র লিখতে শুরু করে; অ্যান্ জানলার ধারে গিয়ে হেলান দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।]

শেক্স : অ্যান্, তুমি আলো আসতে দিচ্ছ না।

[অ্যান্ একপাশে সরে যায়]

অ্যান্ : এখন দেখতে পাচ্ছ?

শেক্স : হ্যাঁ।

[দূরে বাঁশীর শব্দ শোনা যায়]

অ্যান্ : বোধহয় বেদের নাচ।

কণ্ঠস্বর : [গান]

ডাক দিয়েছে লণ্ডন ঐ, আয়রে বোকা মোদের সাথে
চল্ ছুটে ঐ শহর পানে সোজা রে—
থাকবে না তোর ভাবনা কিছুই, ঘুচবে জ্বালা হাতে-নাতে,
বুকের থেকে নামবে দুখের বোঝা রে!

অ্যান্ : বাগানের গেটে মা—সঙ্গে একজন অচেনা লোক!

[অ্যান্ দরজা খুলে দেয়, মিসেস হ্যাথাওয়ে ঢোকেন।]

কণ্ঠস্বর : [আরও কাছে]

ব্যাঙের ডাকে সন্ধ্যা নামে, ঝোপঝাড়েতে ভর্তি গ্রামে;
লণ্ডনে সব আলোয় আলো, থাকবি সেথা খুব আরামে,
উঠছে রে গান, দুলছে রে প্রাণ
উচ্ছল লণ্ডন!
আহা, স্বপ্নের লণ্ডন!

অ্যান্ : মা, আমাদের জন্য কি এনেছ?

মিঃ হ্যাথ : কি আবার আনব বাছা! ভালো কথা, গলির মুখে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল। সে জিজ্ঞেস করলে উইলের বাড়ি কোথায়—উইলকে নাকি তাঁর ভীষণ দরকার।

অ্যান্ : কি চায়, কে সে?

শেক্স : [জানলার ধারে] হেন্স্লো, একজন অভিনেতা। শহরে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কথা বলতে বলতে ওকে আমার নাটকের কথা বলেছিলাম।

অ্যান্ : একজন অপরিচিত অভিনেতাকে বললে তবু তুমি আমাকে বললে না?

কণ্ঠস্বর : [খুব কাছে]

নাই যদি বা থাকিস গাঁয়ে, বরফ পড়বে বনের ছায়ে,
মুখখানা তোর স্মরণ রেখে দেবে না কেউ দিন ফুরায়ে।
ঘুরবে জগৎ বনবনিয়ে
চলবে রে কাজ হনহনিয়ে
তোকে ছাড়াই, তোকে ছাড়াই—
আয় তবে আয় লণ্ডনে যাই,
চল্‌রে বোকা লণ্ডনে যাই!

[শেক্সপীয়র দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

অ্যান্ : [উইলের পথ আটকে] ও কিসের জন্য এখানে এসেছে?

শেক্স : আমার জন্য এসেছে। আমার বাড়িতে এসেছে।

[উইল বাইরে চলে যায়]

মিঃ হ্যাথ : কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?

অ্যান্ : গণ্ডগোল! কার সঙ্গে?—উইলের সঙ্গে? কেন? ও তো আমাকে মারেও নি···উপোস করিয়েও রাখে নি···রাস্তাতেও বের করে দেয় নি!

মিঃ হ্যাথ : একটু বুঝেশুঝে চলতে হয়! —বাচ্চাটার কথা একটু ভাব।

অ্যান্ : আমি কি করব?—আমি কি করব বলতে পার?

মিঃ হ্যাথ : একটু কম কথা বলিস্, আর মনটাকে হাল্কা রাখতে চেষ্টা করিস্।

অ্যান্ : কেমন করে মনকে হাল্কা করব মা। মাগো, তুমি যদি জানতে আমার সামনে কি প্রচণ্ড অন্ধকার! উইলের নৌকোর পালে লেগেছে ঝোড়ো হাওয়া, ওর মনে লেগেছে অচিন্ দ্বীপের নেশা। আর আমি এক টুকরো পলকা দড়ি নিয়ে ওর নৌকোকে ঘাটে বেঁধে রাখতে চাই!

[শেক্সপীয়র এবং হেন্স্‌লো কথা বলতে বলতে ভেতরে ঢোকে]

মিঃ হ্যাথ : [ভেতর দিকে যাওয়ার দরজার কাছ থেকে] আয়, ভেতরে আয়, ওদের একলা থাকতে দে।

অ্যান্ : দেখো, উইলকে দেখো—ওর মুখে কি আশ্চর্য রঙ লেগেছে!

মিঃ হ্যাথ : আমার কথা শোন্, আয় ভেতরে আয়।

অ্যান্ : আমার সাহস নেই মা, আমার সাহস নেই!

মিঃ হ্যাথ : এ রকম অবুঝ হলে কি চলে?—একটু বিশ্বাস করতে হয়—

অ্যান্ : আমার ভয় করছে!

[মিঃ হ্যাথাওয়ে ফায়ার প্লেসের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান।]

হেন্স্ : [শক্ত চেহারা, হাসি-হাসি ভাব, ঝকঝকে চোখ, চলায় নাচের ছন্দ, চেহারায় বয়সের ছাপ। ওর কানে মাকড়ি। পোশাক এক সময় ভালো ছিল, এখন দুমড়ে মুচড়ে গেছে এবং জায়গা জায়গায় কাদা ছেটানো। ওর কাঁধে একটা বাঁশী ঝুলছে।] অভিনয় হবে বৈ কি? তোমার নাটক অভিনয় করব বলেই তো এসেছি।

অ্যান্ : [ওদের পেছন থেকে] উইল!

শেক্স : [ঘুরে] এই আমার স্ত্রী।

অ্যান্ : [অ্যান্ কার্টসি করে। প্রায় নিজের মনে] এই লোকটি কে? কোথা থেকে এসেছে? কি চায়?

হেন্স্ : [শুনতে পেয়ে] আমি মায়ের অধম সন্তান। ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্র।

[শেক্সপীয়র হেসে ওঠে]

অ্যান্ : বিদেশী?

হেন্স্ : হ্যাঁ-ও বলতে পারেন…না-ও বলতে পারেন। এই মুহূর্তে আমি

স্পেনের লোকদের কাঁদিয়ে এসেছি। কিন্তু আমার আস্তানা ব্লাকফ্রায়ার্স। কাজকর্ম কি করি যদি জানতে চান তাহলে বলি শুনুন—ব্যাঙ্কে আমার এ্যাকাউন্ট আছে, লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এক কথায় আমাকে চিনবে, রাণীর দরজা আমার জন্য সব সময় খোলা। আর আমি কে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলতে হয় আমি কে নই! আর এখানে এসেছি কেন? [উইলকে দেখিয়ে] এই লোকটির কপালে রাজতিলক, ওকে আমাদের রাজা করব বলে!

অ্যান্ : ভাগ্য গণনাও করতে পারেন দেখছি!

হেন্স্ : আমার হাতে একটা রুপোর টাকা রাখলেই আমি লোকের ভাগ্য গুনে দিই।

অ্যান্ : বাজে খরচ করার মতো টাকা আমার নেই।

হেন্স্ : সাবধান, দেখবেন, বিনে পয়সাতেই কিন্তু বলে দিতে পারি আপনার নিজের ভাগ্যকেই বড় ভয়!

শেক্স : [নিজের হাত এগিয়ে দিয়ে] আমার হাতে কি ভয় করার কিছু আছে?

হেন্স্ : এতো অভিনেতার হাত—হুঁ…বেশ বাজে হাত। কথার জাদুকর, তোমার সব কথা একদিন ফুরিয়ে যাবে!

অ্যান্ : আমরা ছা-পোষা লোক, আমাদের সঙ্গে আপনার কি দরকার—আমার স্বামীর ক্ষেতের কাজ দেখে—

হেন্স্ : আর গান গায়। সেই গাইয়েকেই তো ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। মহারাণীকে গান শোনাব বলে।

অ্যান্ : কি? কি বললেন?—মহারাণী!

হেন্স্ : হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডের রাণী শুধু যুদ্ধই করেন না, আমাদের মতো গরীব অভিনেতাদের ওপরও তাঁর নজর আছে। তাইতো এসেছি স্ট্র্যাটফোর্ডের হাঁসকে ধরে নিয়ে যাব বলে—রাজপ্রাসাদের সরোবরে খেলা করবে।

অ্যান্ : (নিজের মনে) ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দাও!

হেন্স্ : মা, একটা সোজা প্রশ্ন করি—টেম্‌স্ নদী কি আভনের থেকে চওড়া নয়?

শেক্স : কিন্তু টেম্‌সে কাদাও বেশি।

হেন্‌স্ : তা হতে পারে—তবে টেম্‌সের জলের জাহুর ছোঁয়ায় বাচ্চা হাঁসের পালকে দীপ্তি লাগে।

শেক্স : স্ট্র্যাটফোর্ডের হাঁসের রঙ কিন্তু কালো।

হেন্‌স্ : কালো হাঁসই তো বেশি ছুর্লভ। লণ্ডন থেকে আসার সময় দেখেছিলাম ঐ রকম এক কালো হাঁস [অ্যান্‌কে] লণ্ডন এক আজব শহর! আপনার স্বামী লণ্ডনে গেলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গোটা পৃথিবীকে একটা ছোট্ট আপেলের মধ্যে ভরে নিয়ে আসতে পারে।

অ্যান্ : আমরা সাধারণ লোক। এই ছোট্ট স্ট্র্যাটফোর্ডে অত বড় পৃথিবীর জায়গা কোথায়?

হেন্‌স্ : কেন? আপনার বাগানে পুঁতবেন, জ্ঞানবৃক্ষের ফুলে-ফলে গোটা বাগানটা ছেয়ে যাবে।

অ্যান্ : [অন্যদিকে ফিরে নিজের মনে] আমার বাগানে আগেই ফল ধরেছে!

হেন্‌স্ : [চাপা গলায়] কালো হাঁস তার সঙ্গী কালো হাঁসকে খুঁজছে।

শেক্স : কোনো মেয়ে?

অ্যান্ : [হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে] ও তোমাকে কি বলল উইল?

হেন্‌স্ : আমি আবার কি বললুম? ও···কিছু বলেছি বুঝি? মানে আমি বলছিলাম কি যে লণ্ডনে একজন পুরুষের মতো যে কোনো মেয়েও রাতারাতি তার ভাগ্য ফেরাতে পারে। এই তো, কিছুদিন আগে একটি মেয়ে রাজসভায় এলো···কতই বা বয়স?—বছর ষোল হবে! কিন্তু আজ?—সমস্ত লণ্ডনের সেরা সেরা লোকগুলো ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে—

অ্যান্ : আর মেয়েরা?

হেন্‌স্ : ওর পায়ের তলায়।

অ্যান্ : রাণী কি বলেন?

হেন্‌স্ : চুপ করে দেখেন আর কালো মেয়ের পায়ের তলায় হাজার পুরুষের রঙ্গ দেখে হাসেন।

অ্যান্ : ওঃ, মা!—

হেন্‌স্ : তোমার স্ত্রী কি অসুস্থ, উইল?

শেক্স : অ্যান্!

অ্যান্ : আমি একটু বসছি। আমার বড্ড ছুর্বল লাগছে।

শেক্স : আমি তোমার মাকে ডেকে নিয়ে আসছি। [বেরিয়ে যায়]

অ্যান্ : তাড়াতাড়ি ··উইল আসার আগে শীগ্‌গির বলুন—ঐ মেয়েটির কি নাম?—কেমন দেখতে ওকে?—বলুন···বলুন।—স্ট্র্যাটফোর্ডে এত বাড়ি থাকতে কেন আমাদের বাড়িতে এলেন আপনি? ওঃ ঈশ্বর! আমি বেশ বুঝতে পারছি—আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে—কেন, এত প্রশংসা করলেন এই মেয়েটির, কেন বললেন উইলকে লণ্ডনের কথা?—আপনি কেমন করে বুঝবেন আমার কি ক্ষতি হয়ে গেল আজ?—ঐ মেয়েটিকে কি খুব সুন্দর দেখতে? —বলুন তাড়াতাড়ি বলুন!

হেন্‌স্ : সত্যি কথা বলতে এমনটি আর দেখিনি। ময়ূরপঙ্খী বজরা যখন জোয়ারের সময় ভরা পালে ভেসে যায়—তেমনি এই লণ্ডনের কৃষ্ণকলি। ওর বড় গর্ব প্রত্যেক পুরুষ ওর আঙ্গুলের ইশারায় নাচে। তবে একজন মেয়ে···

অ্যান্ : কোন্ মেয়েকে ভয় করে ও?

হেন্‌স্ : মহারাণীকে।—আমি ওর চোখে ভয়ের আভাস দেখেছি।

অ্যান্ : আমি মহারাণীকে ভয় করি না।

হেন্‌স্ : [মুচকি হেসে] ইংলণ্ডেশ্বরীকে চেনেন না আপনি। যখন তিনি অল্প হেসে আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করতে থাকেন তখন মুহূর্তের ইশারায় যে কোনো লোকের ভাগ্য নির্ণয় হয়ে যায়।

অ্যান্ : আমি মহারাণীর ছবি দেখেছি। ছুশ্চিন্তায় ক্ষয়ে যাওয়া চেহারা··· আমার মতো। রাণীকে আমার ভয় নেই। তিনি নিজের মনের জ্বালা দিয়ে আমার যন্ত্রণা বুঝতে পারবেন।···কিন্তু এই মেয়েটি— এর নাম কি?

হেন্‌স্ : মেরী—

[শেক্সপীয়র মিসেস্ হ্যাথাওয়েকে নিয়ে ঢোকে]

অ্যান্ : মেরী! মেরী!—বহুদিন আগে আর একজন মেরী আমার বোন এলিজাবেথের পথের কাঁটা হয়ে এসেছিল না?

হেন্‌স্ : উইল! তোমার স্ত্রী কি পাগল হয়ে গেছে? ও বলে কি না মহারাণী এলিজাবেথ ওর বোন!

অ্যান্ : আমি পাগল নই···আমি পাগল নই···। কিন্তু উইলকে বলুন 'আমি পাগল'—ও তাহলে আপনাকে মাথায় নিয়ে নাচবে।

হেন্‌স্ : তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে, বন্ধু।—অন্য কোনো সময়···অন্য কোনো জায়গায়—

শেক্স : কি ব্যাপার! তুমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছ?

হেন্‌স্ : তোমার স্ত্রী বোধ হয় খুব অসুস্থ—

শেক্স : হ্যাঁ—এত অসুস্থ যে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু এত অসুস্থ নয় যে—(অ্যান্‌কে চুপি চুপি) অ্যান্! ও চলে যেতে চাইছে কেন? কি বলেছ তুমি আমার বন্ধুকে?

অ্যান্ : তোমার বন্ধু?

শেক্স : হ্যাঁ, আমার বন্ধু!

অ্যান্ : যে লোকটিকে তুমি জীবনে একবার মাত্র দেখেছ, সে তোমার বন্ধু? কি চায় ও এখানে? কেন এসেছে এই ভবঘুরে লোকটা?—কেন?

শেক্স : চুপ কর! আমার বাড়িতে আমার বন্ধুদের সম্পর্কে এ রকম কথা বলার সাহস কোথা থেকে এল তোমার?

অ্যান্ : চুপ করব না আমি!

শেক্স : চুপ কর বলছি!

অ্যান্ : করব না চুপ, কিছুতেই না···কিছুতেই না।···মারলে—তুমি আমাকে মারলে উইল···।

শেক্স : কি বলছ তুমি? আমি তোমাকে ছুঁই নি।

অ্যান্ : এঁ্যা! মারো নি! তবে···তবে··· আমার এত কষ্ট হচ্ছে কেন? এখানে···এখানে এত যন্ত্রণা···

মিঃ হ্যাথ : খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? আমার সঙ্গে আয়···। আয় অ্যান্। চিন্তা কোরো না, ভয়ের কিছু নেই···আমি বুঝেছি ওর কি হয়েছে। (শেক্সপীয়রকে) তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

অ্যান্ : মা, মাগো, আমার বুকের এখানটায় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে—(দু-জনে বাইরে যায়)।

শেক্স : ওঃ! আমি পাগল হয়ে যাব। এই মেয়েরা যখন আঁকড়ে ধরে··· ডুবে-যাওয়া মানুষ যখন জলের ওপরে ওঠার জন্য পাগল হয়ে উঠে···

তখন যদি কেউ তাকে আঁকড়ে ধরে···ঠিক তেমনি···ওঃ মনে হচ্ছে আমার দম আটকে আসছে!

হেন্‌স্ : বেশি দিন মিশলে সব মেয়েই ঐ রকম করে। আমি বলি কি গান গাও আর ফুর্তি কর।

শেক্স : আমার মা—

হেন্‌স্ : (কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে) হুঁ···তোমার মা—

শেক্স : আমার মা এরকম ছিলেন না। শান্ত, সমাহিত।—ইউক্যালিপটাস্ গাছের মতো—ঝড়ে, দমকা হাওয়ায় অনড়, অচঞ্চল। হেন্‌স্‌লো! তুমি এরকম মেয়েদের দেখেছ?—এরকম কোনো মেয়েকে—

হেন্‌স্ : লণ্ডনে এসো···নিজের চোখ ভরে দেখতে পাবে।

শেক্স : লণ্ডন! লণ্ডন চিরকাল আমার স্বপ্নই থাকবে। হেন্‌স্‌লো, তুমি জানো না···আমার ডানা গেছে ভেঙে, পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ী। লণ্ডন চিরকাল আমার কল্পলোকের দিগন্তেই থাকবে, কোনো দিন এগিয়ে আসবে না।—তুমি হাসছ?—কেন?

হেন্‌স্ : আমি ঐ লণ্ডনেই থাকি।

শেক্স : ওঃ! আমি যদি তুমি হতাম! তাহলে দেখতে···লণ্ডনের হাজারো মুখ, অসংখ্য কণ্ঠস্বর আমার কাছে এসে ভিড় জমাত প্রকাশের অনুনয় নিয়ে। আর আমি—সম্রাটের মতো আমার কল্পলোকে ডেকে নিতাম তাদের।—আমার সুরের তালে তালে তারা নেচে উঠত!··· তারপর একদিন···কে জানে···হয়তো আমার গানে মুগ্ধ হয়ে ইংলণ্ডেশ্বরী···হ্যাঁ, ইংলণ্ডেশ্বরী···আঃ যদি আমি লণ্ডনে যেতে পারতাম!

হেন্‌স্ : আমাদের সঙ্গে চলে এস। তোমার কাজ তৈরি আছে···আমরা আজ রাতে লণ্ডন রওনা হচ্ছি।

শেক্স : আমার পথ লণ্ডনের পথ নয়! সারা জীবন আমায় স্ট্র্যাটফোর্ডের চারপাশের রাস্তায় ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে।···এই গোলকধাঁধা থেকে আমার মুক্তি নেই···।

হেন্‌স্ : যেমন তোমার পছন্দ।

শেক্স : আমার পছন্দ! আমি পছন্দ করব। আমি বিবাহিত এমন একটি মেয়ের সঙ্গে যার জীবনে আমার প্রয়োজন আর সব কিছুর থেকে

বেশি।…আমার বয়স কুড়ি।—কেন, কেন তুমি এলে হেন্‌স… সংসারের কাজে ফাঁকি দিয়ে পলাতক আমি সারাদিন স্ট্যাটফোর্ডের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম…শিশিরের বুকে পৃথিবীকে দেখে … যেতাম…রডোড্রেণ্ডনের গন্ধে চমক লাগত আমার… চাঁদের আলো… মাতাল হয়ে অতন্দ্র চুপ করে থাকতাম…ভাবতাম, একি বিস্ময়… এমনি এক রাতে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল আমার কাছে। আমার হাত ধরে বলল, 'ভালোবাসো, ভালোবাসো, আমায় ভালোবাসো'… …চাঁদের আলোয় সব কিছু যেন কেমন হয়ে যায়।—নিয়ে এলাম তাকে আমার ঘরে…অন্ধকারে সেই রহস্যময়ী মিলিয়ে গিয়েছে… পড়ে রয়েছে…। উঃ আমি বড় ক্লান্ত!

হেন্‌স্ : তুমি বরং তোমার স্ত্রীকে বল মহারাণী তোমাকে তলব করেছেন…।

শেক্স : সত্যি? সত্যি মহারাণী আমাকে—

হেন্‌স্ : ভ্যালা বিপদে পড়লুম। সোজা কথাটা বোঝে না। জগতে কোন স্ত্রী আছে নিজের স্বামীর আখেরটা বুঝবে না? তোমার স্ত্রীকে যদি বোঝাতে পার মহারাণী তোমায় বড়লোক করে দেবেন…বাস কেল্লা ফতে।

শেক্স : অ্যান্‌কে বলব বলছ…

হেন্‌স্ : হ্যাঁ, তাই বলছি। ওকে বুঝিয়ে বল। আমি রাতে আসব, যাবে কি যাবে না তখন বোলো। আমি এখন চলি…দলের সবাই … সরাইখানায় নরক গুলজার করছে…এখন থেকে তাগাদা না লাগালে আজ রাতে আর যাওয়া যাবে না।

[বেরিয়ে যায়]

শেক্স : আজ রাতে! (চেঁচিয়ে ডাকে) অ্যান্! অ্যান্! (ইতস্তত পায়চারী করতে থাকে) ওঃ আজ রাতে যদি ঐ কুয়াশায় … রুপোলি পথ ধরে লণ্ডনের পথে পাড়ি দিতে পারি! (চেঁচিয়ে) অ্যান্!

অ্যান্ : (ঢুকতে ঢুকতে) তুমি ডাকছিলে? তোমার সঙ্গী চলে গেছে? উইল, তুমি কি এখনও রেগে আছ? লক্ষ্মীটি, এখন রাগ নয়… আজ আমাদের আকাশে এক নতুন তারা উঠেছে…।

শেক্স : তুমি…তুমি জানলে কি করে?

অ্যান্ : আমি জানি…ওঃ…আমার কি খুশি লাগছে।

শেক্স : অ্যান, মিষ্টি…লক্ষ্মী সোনা…। তুমি তাহলে জানো? তোমার ভয় করবে না? তোমার ভালো লাগবে? অ্যান্ তুমি কি করে জানলে?

অ্যান্ : মা বলল আমায়।

শেক্স : তোমার মা আমাদের কথা শুনেছেন? জানো মহারাণী আমার নাটকের কথা শুনে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আঃ লণ্ডন! লণ্ডন!…আমি লণ্ডন যাচ্ছি তোমার একটুও খারাপ লাগছে না? এই তো…এই তো আমার সোনা মেয়ে…আমার লক্ষ্মী বৌ…

অ্যান্ : আঃ মা! এতো তারা নয়…এ যে উল্কা—হঠাৎ মিলিয়ে গেল… অন্ধকারে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, মা!

শেক্স : তোমার মা তোমাকে কি বলেছেন?

অ্যান্ : কিছু নয়। আঃ ওরকম শক্ত করে তাকাচ্ছ কেন? লণ্ডনে যাচ্ছ তুমি! মহারাণী তোমাকে ডেকেছেন? আমি নিশ্চয় সাহায্য করব তোমায়।…তোমার আনন্দেই আমার সুখ!

শেক্স : অ্যান্, স্ট্রাটফোর্ড থেকে বিদায়…যতদিন না জীবনের লড়াই শেষ হয়।

অ্যান্ : ক্ষেত-খামার তাহলে সব বেচে দিতে হবে।

শেক্স : কেন? বেচতে হবে কেন?

অ্যান্ : বোকা ছেলে! নাহলে আমাদের চলবে কি করে লণ্ডনে?

শেক্স : কি বললে তুমি? আমাদের? ওরা যে পথ দিয়ে যাবে সে পথ বড় কঠিন—

অ্যান্ : আমি ভয় করি না!

শেক্স : তুমি অসুস্থ!

অ্যান্ : ও কিছু নয়। আমি ঠিক হয়ে গেছি।

শেক্স : না! না! না! তা হয় না! আমি জীবনকে একা দেখতে চাই! তোমার ফ্রকের কোণে মুখ ঢেকে আমি সারাজীবন কাটাতে পারব না।

অ্যান্ : আমি তোমার কোনো অসুবিধে ঘটতে দেব না। স্ত্রী হিসেবে না হোক সঙ্গিনী করে নাও আমাকে!

শেক্স : না—আমি বলছি তা হয় না! পৃথিবীকে নিজের মতো করে
জানতে দাও। তুমি আমার থেকে সাত বছরের বড় বলে
কাছে আমায় জীবনের শিক্ষা নিতে হবে?

অ্যান্ : ঈশ্বর! এও ছিল আমার ভাগ্যে!

শেক্স : তুমি জানো না · আমার সমস্ত ইচ্ছেগুলো এই চার দেওয়া
মাঝখানে ঘুরপাক খেয়ে মরে···ওরা চায় সূর্যের আলো দেখতে
কিন্তু তুমি···তুমি দরজা বন্ধ করে রেখেছ।

অ্যান্ : আমি এখন কি করব? কেমন করে আমার দিন কাটবে?
কেন তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে?

শেক্স : এই কেন-র উত্তর তুমি নিজেই ভালো করে জানো!

অ্যান্ : জানি বৈকি, খুব ভাল করেই জানি যে তোমার অলস মুহূর্ত
কাটানোর জন্য আমায় কাছে টেনেছিলে।

শেক্স : তোমার বোকামির জন্য তুমিই এগিয়ে এসেছিলে—আমি তোমা
চাই নি।

অ্যান্ : মিথ্যে কথা ··মিথ্যে কথা! নিজের কাজ ফেলে Shottery-র
আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে না তুমি? রবিবার চার্চ থেকে
সময় আমাকে ডেকে নিয়ে মেঠো আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে হারিয়ে
না তুমি? তারপর···তারপর সন্ধ্যে নেমে আসত·· চাঁদ
আকাশে···। কেন, কেন তুমি আমার সঙ্গে থাকতে···আমা
ভালোবাসাতে আর বিশ্বাস করতে বাধ্য করাতে যে তুমি আমা
ভালোবাসো।

শেক্স : আমার অলস প্রহর তোমার পূজা নিয়ে কেটে যেত।
সুলভ ছিলে।

অ্যান্ : (চিৎকার করে) মিথ্যে কথা!

শেক্স : মিথ্যে কথা? আমি সেই দিনগুলোয় তোমার চোখে
স্তুতির ভাষা! করতে না তুমি আমায় পুজো যেন আমি
দেবতা!—সেদিন ভালো লেগেছিল সেই নিবেদিতার নিবেদন
আমার কাছে সে শুধুমাত্র অলস খেলা—আমি অনেক বদলে

অ্যান্ : তুমি বদলাতে পার; আমি পারি না। আমি চিরকালের
আমার পরিবর্তন নেই। তুমি হাত বাড়ালে সমস্ত পৃথিবী

ওঠে—অন্যদিকে মুখ ফেরালে দু-চোখ ভরে নামে আঁধার। তবু এই
কান্নাহাসির দোলার মাঝে সব সময় আমি তোমাকে ভালোবাসি···

শেক্স : অলস কথায় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। লণ্ডন আমাকে
যেতেই হবে—পারলে আজ রাতেই—

অ্যান্ : আজ রাতেই?

শেক্স : যত তাড়াতাড়ি পারি।—বাচ্চাটি জন্মালেই—কবে বাচ্চাটির জন্ম
হবে?

অ্যান্ : খুব শিগ্‌গির; আর বেশি দিন নেই—

শেক্স : কবে?

অ্যান্ : আমি—আমি ঠিক জানি না ··

শেক্স : মার্চে?

অ্যান্ : কি জানি···বোধ হয়—

শেক্স : তুমি মার্চে বলেছিলে না?

অ্যান্ : বোধ হয় ঈস্টারে—

শেক্স : ঈস্টার তো মে মাসে—মার্চে হওয়ার কথা?

অ্যান্ : তাহলে··তাহলে বোধ হয় মার্চেই—

শেক্স : কি ব্যাপার, অ্যান্?

অ্যান্ : আমার সঙ্গে আরও কিছুদিন থাক। বসন্তের পরে গ্রীষ্ম আসবে—
তখন·· তখন যেও। কিন্তু তখন তুমি আর যেতে পারবে না, আমি
জানি।

শেক্স : গ্রীষ্ম! গ্রীষ্ম কেন? বসন্তেই হওয়ার কথা?—

অ্যান্ : আমি এসব প্রশ্নের উত্তর দেব না—আমার গোপন কথা গোপনই
থাকুক!

শেক্স : গোপন কথা!

অ্যান্ : গোপন কথা—আমার কি গোপন কথা থাকতে পারে?—আমি
ওকথা বলতে চাই নি!—আর যদি থাকেই···তোমার স্বপ্ন তুমি
গোপন করে রাখতে পার আমি পারি না—

শেক্স : বাচ্চাটি কবে হবে?

অ্যান্ : জুন··মা বলে জুনে··কি জানি হয়তো জুলাইতে···এসব মেয়েদের
কথা তুমি বুঝবে না।

শেক্স : জুলাই ?

অ্যান্ : ওঃ। তুমি তাকিয়ে আছ কেন? ওরকম করে তাকিও না জুন না, বোধ হয় মে মাসেই···মে তো বসন্তেরি পূর্ণ প্রকাশ—

শেক্স : জুলাই! গত জুলাইতে তুমি আমায় কাছে এসেছিলে—আগামী জুলাই-এ পুরো এক বছর হবে! তাহলে তুমি যখন অঝোরে কেঁদে বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে আমার হাত ধরে বলেছিলে আমি তোমাকে গ্রহণ না করলে আভনের জল ছাড়া তোমার আর কোনো পথ খোলা নেই···তখন···তখন তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে?

অ্যান : আমার দিকে অমন করে তাকিও না।

শেক্স : প্রয়োজন নেই।—মিথ্যে দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে রেখেছ!

অ্যান্ : আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম।

শেক্স : তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে?

অ্যান্ : তোমাকে পাওয়ার জন্য। তোমাকে হারানোর ভয়ে···যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম!

শেক্স : তুমি এত নোংরা, নীচ যে যন্ত্রণার জ্বালায় আত্মসম্মান ভুলে গেলে—মিথ্যে কথা বললে! তোমার জন্য হয়তো কষ্ট পেতে পারতাম—কিন্তু তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছ! তোমার একটু লজ্জা করল না মিথ্যে বলে আমাকে আটকাতে যখন তুমি খুব ভালো করে জানতে আমি তোমাকে ভালোবাসি না!

অ্যান্ : নাঃ, অন্তত সেই একটি মাস চাঁদের আলোয়, কুয়াশার কুহকে···তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে!

শেক্স : কোনোদিন আমি তোমাকে ভালোবাসি নি।

অ্যান্ : মনে কর—যেদিন আমার হাতে বুনো গোলাপের কাঁটা ফুটেছিল আমার হাত ধরে মিষ্টি করে ডাক নি 'অ্যান্'?

শেক্স : আমি ভুলে গেছি সেসব কথা।

অ্যান্ : গত বাসন্তী পূর্ণিমায় চাঁদের আলোয় যখন স্ট্র্যাটফোর্ড ভেসে গিয়েছিল সেই রাতে আমায় কাছে টেনে···অতি যত্নে···গোপনে তোমার স্বপ্নের কথা বল নি আমায়!

শেক্স : সেই রাতে আমি স্বপ্ন-বিভোল ছিলাম।

অ্যান্ : সেই রাতে—সেই রাতটির জন্য অন্তত তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে

উইল! সেই পবিত্র চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে একবার তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে!

শেক্স : তুমি জানতে তা আর যাই হোক প্রেম ছিল না।

অ্যান্ : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হ্যাঁ, আমি জানতাম।—আমি জানতাম তুমি আর আসবে না। আমি অপেক্ষা করলাম···ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম দিনরাত···তুমি আর এলে না। আমার লজ্জা করত ভেবে—আমি নিজে যাব তোমার কাছে? রাতের পর রাত।—দিনের পর দিন কাটল অপেক্ষা করে। শেষে আর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গেলাম একদিন তোমার কাছে সব লজ্জা ছেড়ে।

শেক্স : হ্যাঁ, মিষ্টি মিথ্যের উপহার নিয়ে।

অ্যান্ : মিথ্যে বলছ কেন? বল স্বপ্ন—আমার স্বপ্ন, একটি ফুটফুটে বাচ্চা তোমাকে বেঁধে রাখবে আমার সঙ্গে।

শেক্স : তুমি কি পাগল?

অ্যান্ : সেদিন আমি পাগল হয়েছিলাম, এখন নয়।

শেক্স : কেন তুমি এরকম করলে—কিসের লোভে?

অ্যান্ : কিসের লোভে?—তোমাকে পাওয়ার জন্য। বিশ্বাস কর, আমার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না! কেন আমি এরকম করলাম তা বুঝবে না উইল?—আমায় দয়া কর, উইল—আমাকে দয়া কর!

শেক্স : দয়া! তোমাকে আমি চিনি না। তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বললে?

অ্যান্ : নিষ্ঠুর! কি প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলে আমি এইরকম করেছি তা বুঝলে না?···শুধু এক কথায় রায় দিয়ে দিলে 'মিথ্যেবাদী'!

শেক্স : যত সাজিয়েই কথা বল মিথ্যে সব সময়েই মিথ্যে। এতদিন তোমার সব সহ্য করেছি দাঁতে দাঁত চেপে···ভেবেছিলাম অন্তত বিশ্বাসটুকু আছে আমাদের সম্পর্কে—

অ্যান্ : বলে যাও!

শেক্স : বল। তুমি নিজেই বল।—কবে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি?

অ্যান্ : বলে যাও।

শেক্স : কি দরকার? এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি, একটি কথাও বলি নি।

আজ বলার দরকার ফুরিয়েছে—আমি মুক্ত !···আমি আজ থেকে মুক্ত···আমার আর কোনো পিছু টান নেই।—

অ্যান্ : (উইলের হাত ধরে) তুমি যাবে না !

শেক্স : আমি যাবই—আমার পার্স···কাগজপত্র—

অ্যান্ : উইল !

শেক্স : দেওয়ালকে বল যা বলার আছে। আমার শোনার প্রবৃত্তি নেই।

অ্যান্ : উইল ! একজন খুনী আসামীকেও আমার মতো অবস্থায় লোকে দয়া করে। আর আমি···আমি তোমাকে শুধু ভালোবেসেছি—আর কোনো অপরাধ তো আমি করি নি। এখন কেন আমাকে ফেলে যাচ্ছ যখন সেদিনের মিথ্যে আজ সত্যে পরিণত হয়েছে—ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই আমার সত্তায় ঘুমিয়ে রয়েছে !

শেক্স : আবার নতুন করে মিথ্যে ?

অ্যান্ : মিথ্যে নয় উইল, মিথ্যে নয় !

শেক্স : ছোটবেলায় স্কুলে পড়েছি, যত অভ্যাস করবে ততই ফল পাবে !

অ্যান্ : আমি শপথ করে বলছি—

শেক্স : আগেও যেমন শপথ করেছিলে ! দু-বার আমি ঠকতে রাজী নই অ্যান্ !

অ্যান্ : আমার সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তে একি অভিশাপ দিলে তুমি, ঈশ্বর

[ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অসহায় ভাবে ফায়ার-প্লেস-এর পাশে অ্যান্ বসে পড়ে। অনেক-গুলো কণ্ঠস্বর কাছে আসতে থাকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গানের কথা শোনা যেতে থাকে।]

অভিনেতার দল (গান) :

ডাক দিয়েছে লণ্ডন ঐ, আয়রে বোকা মোদের সাথে
চল ছুটে ঐ শহর পানে সোজা রে—
থাকবে না তোর ভাবনা কিছুই, ঘুচবে জ্বালা হাতে-নাতে
বুকের থেকে নামবে দুখের বোঝা রে—।
বৈঁচি ভরা বনের ছবি—থাক পড়ে থাক পিছে সবই,
লণ্ডনে যে ফলের মেলা—আস্বাদে তার মাতাল হবি।

এক্ষুনি চল, লণ্ডনে চল,
স্বপ্নের লণ্ডন !
[আহা] উজ্জ্বল লণ্ডন !

[উচ্চগ্রামের গান ধীরে ধীরে গুণগুণানিতে নেমে আসে। হেন্‌স্‌লো জানলা দিয়ে উঁকি মারে]

হেন্‌স্‌ : সূর্য ডুবল বলে···আকাশটা সোনালি হয়ে উঠেছে···। উইল, কি ঠিক করলে ?

শেক্স : সোনালি কুয়াশার ওপারে লণ্ডন···লণ্ডন !

হেন্‌স্‌ : চলে এস তাহলে।

শেক্স : একটু অপেক্ষা কর—আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই।—ও কাদের গলা ?

হেন্‌স্‌ : দলের অভিনেতারা—তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

শেক্স : তুমি ভেতরে এস।

হেন্‌স্‌ : তোমার স্ত্রী কি ভেতরে আসতে বলেন ?

শেক্স : স্ত্রী ? কে স্ত্রী ? [খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে চলে যায়]

[হেন্‌স্‌লো ঘুরে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়]

হেন্‌স্‌ : ভেতরে আসব ?

অ্যান্ : উইল কি বলল তা তো শুনলেন !

হেন্‌স্‌ : আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

অ্যান্ : এটা উইলের বাড়ি—আমার নয়।

হেন্‌স্‌ : (স্বর ভাঁজতে ভাঁজতে)

এক্ষুনি চল্, লণ্ডনে চল্,
স্বপ্নের লণ্ডন !
[আহা] উজ্জ্বল লণ্ডন !

বড্ড দেরী করছে উইল। চাঁদ উঠে গেছে—এর মধ্যেই কুয়াশা ঘন হয়ে এসেছে—রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে।

অ্যান্ : (জানলার ধারে গিয়ে) সত্যিই কুয়াশা বড্ড ঘন।

হেন্‌স্‌ : ও কি করছেন ? লোকে বলে কাঁচের ভেতর দিয়ে চাঁদ দেখলে কপাল পোড়ে।

অ্যান্ : আমার কপাল সেদিনই পুড়েছে যেদিন কুয়াশার ধোঁয়ার ভে
দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি—আশীর্বাদ চেয়ে!

হেন্‌স্ : আমি আগেই বলি নি ; আপনার নিজের ভাগ্যকে বড় ভয়!

[শেক্সপীয়র সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরের মধ্যে ঢোকে,
হাতে একটা পুঁটলি]

শেক্স : অ্যান্, তুমি ঐ যারা বাইরে ঠাণ্ডায় কাঁপছে ওদের ভেতরে এ
বসালে পারতে তো, কিছু খাবার-দাবার দিতে পারতে ওদের।

হেন্‌স্ : (ওদের কাছে এসে) তুমি তৈরি? চাঁদ অনেকটা ওপরে উঠ
গেছে—আমাদের কিন্তু এক্ষুণি রওনা হতে হবে।

শেক্স : তোমরা এগোও ; আমি এক্ষুণি তোমাদের ধরে নিচ্ছি।

[হেন্‌স্‌লো বেরিয়ে যায়। আস্তে আস্তে
আবার গান ভেসে আসে···ক্রমে মিলিয়ে
যেতে থাকে। উইল টেবিলের ধারে গিয়ে বই
গোছাতে থাকে।]

ডাক দিয়েছে লণ্ডন ঐ, আয়রে বোকা মোদের সাথে
চল্ ছুটে ঐ শহর পানে সোজা রে—
থাকবে না তোর ভাবনা কিছুই, ঘুচবে জ্বালা হাতে-নাতে,
বুকের থেকে নামবে দুখের বোঝারে—!
নাই যদি বা থাকিস গাঁয়ে, বাইরে হাওয়া বনের ছায়ে ;
শস্যে ভরে উঠবে রে মাঠ, দেবে সবার প্রাণ জুড়ায়ে—
তোকে ছাড়াই, তোকে ছাড়াই—
আয়রে তবে লণ্ডনে যাই—
চল্‌রে বোকা লণ্ডনে যাই—!

অ্যান্ : উইল!

শেক্স : তোমার প্রয়োজনের জন্য ক্ষেত-খামার সব রইল।

অ্যান্ : উইল! (উইলের হাত আঁকড়ে ধরে) আমার বড্ড ভয় করে
এ রকম নিঃসঙ্গ আমায় ফেলে যেও না—আমায় তোমার সঙ্গে নি
যাও! না, তুমি এইখানেই থাক···দেখ একটু পরেই মনে হ
এতক্ষণ যা ঘটেছে সব দুঃস্বপ্ন।

শেক্স : আমার যে ক্ষতি তুমি করেছ তা আমি কোনোদিনও ভুলব না।

অ্যান্ : ভুলে যেতে তো বলিনি···বিস্মৃতি তো ঘৃণার থেকেও অসহ্য। মনে
রেখো আমাকে। আর মনে রেখো--নানান্ লোকের ভিড়ে তুমি
যখন হাঁপিয়ে উঠবে, নানান্ কাজের খেলা যখন ফুরোবে তোমার
···তখন···আমি···আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

শেক্স : নাটক শেষ কর···আমাকে যেতে দাও।

অ্যান্ : মনে রেখো জীবন-জীবন খেলা শেষ হলেও জীবনের অনেকটা পড়ে
থাকবে তখনও আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য।

শেক্স : আমি চললাম।

অ্যান্ : জীবনের সব প্রয়োজন ফুরোলে, ক্লান্তিতে কারো কোলে মাথা রেখে
ঘুমোতে ইচ্ছে হলে মনে রেখো—আমি রইলাম—

শেক্স : কোনোদিন নয়!

[উইল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, একটু পরেই
কয়েক মুহূর্তের জন্য জানলা দিয়ে ওর মূর্তি
silhouette-এ দেখা যায়]

(দূর থেকে) আঃ লণ্ডন! লণ্ডন! লণ্ডন!

অ্যান্ : (হঠাৎ চিৎকার করে) আঃ আকাশটা এত কালো কেন মা?

মিঃ হ্যাথ : (ভেতর থেকে) অ্যান্! অ্যান্! তুই কোথায়!

[দরজা দিয়ে ঢোকেন]

অ্যান্, অ্যান্! এই অন্ধকার···ঠাণ্ডায় একলা কি করছিস তুই!

অ্যান্ : আমি অপেক্ষা করছি!

—পর্দা—

(ক্রমশ)

কালিদাস দত্ত

স্বর্গারোহণ

জুড়ানের ঘুম ভাঙল আচমকা। বুকে যেন বিছায় কামড় দিল। চতুর্দিক আন্ধার। আকাশ ম্যাঘ-ম্যাঘ। বুক্ ডলা দিল জুড়ান। জোরের চোটে বুকের গাছ কয় লোম উঠে এল হাতে। না, বিছায় কামড়ায় নাই। জলুনি জলে বুকের অভ্যন্তরে। কামড়ায়, দিবারাত্র কি যেন কামড়ায়। কামড়াইবো না? আঙ্গিজ-ই তো শ্যাষ দিন। ঈশ্বর, আঙ্গিজ-ই আমাগো শ্যাষ দিন।

কুসুমকে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, অ ছোট বৌ, ছোট বৌ, অ পরাইণ্যার মা, ওঠো না? রওনা দেবা কখন? ওঠো, আর ঘুমাইও না। হের পর পথে লোকজন চলব-ফিরব।

জুড়ানের ইচ্ছা করল, কুসুমকে এই অন্ধকারে, এই বাহু-মেলা বৃক্ষের তলায়, কালো নক্ষত্রখচিত আকাশকে সাক্ষী রেখে শেষবার আদর করে, জীবনের শেষ সুখ ওর শরীরে গেঁথে দেয়। কিন্তু শক্তি নাই, মাথা ঝিম ঝিম করে, পেটে তিন দিন ভাত না পড়লে শরীর কথা শোনে না।

: ওঠলানি?

কোলের শিশুটি ক্ষীণস্বরে আর্তনাদ করে উঠল। কুসুম ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘুম-জড়ানো চোখে আতঙ্ক-মেশানো কণ্ঠে বলল, ভোর হইছে?

: ভোর কই? দেরী আছে ভোরের। অখনই রওনা দিতে হয়। দূর আছে না? এক কোড়শ হাঁটন লাগবো। ওরে অ পরাইণ্যা, ওঠো বাবা। আর ঘুমায় না। বিমলির ঘুম দেহি ভাঙে না। এত চিক্‌খইরেও মাইয়া ঘুমায় গ্যাহো—

বিমলি আগেই জেগেছিল। মুখ গুঁজে পড়েছিল মাটিতে। পরনের তেনা হাঁটুর ওপর উঠে গিয়েছিল। শীত শীত লাগছিল, আশ্বিন মাস, ভোরের দিকে এখন শীত পড়ে বেশ, এক পা অন্য পায়ে ঘষে পরনের তেনা টেনে নামাবার চেষ্টা করছিল। এবার বুকে আড়াআড়ি ভাবে দু-হাত জড়িয়ে

উঠে বসল, হাঁটুতে মুখ গুঁজে ও কাঁদতে থাকল নীরবে। কী যেন একটা বিভীষিকার ষড়যন্ত্র চলছে। তের বছরের কিশোরী আঁচ করতে পারছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না। বুকের মধ্যে একটা হুতাশ ঠেলে ঠেলে উঠছে, ও বুঝতে পারছে না। বাবা আর মা তিন দিন ধরে কি যেন একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করছে। দু-দিন হল শহরের আস্তানা ছেড়ে ওরা কেবল হাঁটছে। নাওয়া নাই; খাওয়া নাই, কেবল হাঁটছে। কোন্ অজানা নিরুদ্দেশ জগতের দিকে ওরা কেবল হেঁটেই চলেছে।

গতকাল ভয়ে ভয়ে ও একবার জিজ্ঞেস করেছিল মাকে, কই যাইত্যাছি মা আমরা? শরীল যে আর বয় না, মা? তোমার পায়ে ধরি, কও, কই চলছি আমরা?

কুসুম উত্তর দিয়েছিল, কইলকাতা।

তারপর একটু থেমে বলেছিল, নারে বিমলি। মিছা কইলাম তোরে। চলছি আমরা স্বর্গে। তুমি বড়ো হইছ মা। পরাইণ্যা যেন ট্যার না পায়। স্বর্গে গেলে তুমি সুখে থাকবা।

স্বর্গ কোথায় কি বৃত্তান্ত কিছুই জানে না বিমলি। তবু অনেক সুখের আশ্বাস সত্বেও ওর কচি বুকের মধ্যে কি যেন এক আথালি-পাথালি চলছিল. কেমন যেন দ্রুত কণ্ঠ শুকিয়ে আসছিল, ঘন ঘন তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

দূরে বোধ হয় কোনো গির্জা কিংবা কবরখানা আছে। ঢং ঢং শব্দে রাত্রি দুটো বাজল। কালো আকাশে উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র আড়াআড়ি ভাবে খসে পড়ল। অরণ্যসদৃশ প্রান্তরে পেঁচার কর্কশ মৃত্যুসঙ্গীত শোনা গেল।

বাবার চোখের দিকে পিচুটি-মাখা লাল চোখে অপলক তাকিয়ে পরাণ বলল, মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভাঙাইলা ক্যান্ বাবা?

জুড়ান বোকার মতো হাসার চেষ্টা করল। ওকে কেমন ভীতু এবং দুর্বল বোধ হচ্ছিল। কোথায় যেন কোন্ অশান্তি হৃদয়ের মাটি খুবলে খুবলে সাহস এবং শক্তির শিকড়গুলো আলগা করে দিয়েছে। যেন নেশাতুরের মতো নেশার ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা উচ্চারণ করছে। বললে, আমরা অখন হাঁটা দিমু, বাবা।

: ক্যান্? এত রাত্তিরে ক্যান্? মোটে তো রাইত দুইটা বাজল?

: আরে ছাওয়াল। তকরার করতে নাই। আমি তোর বাবা।

তগো মঙ্গলের জন্যই দিবারাত্র চিন্তা করি। অখন হাঁটা না দিলে ষ্টিমার ধরন ক্যামনে? কথা বোজছ? আইজই ষ্টিমার ধরন চাই।

কুসুম বুকের শিশুকে বিমলির কোলে দিল। অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোয় ভৌতিক, ছায়া ছায়া, আবছা আকারের অদূরবর্তী জুড়ানের চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, কুপিটা ধরাও এট্টু।

: কাম নাই, কাম নাই। হ্যাখনের কিছু লাগবো না। চলো হাঁটা দি। আন্ধারই ভালো।

: ভাত রান্ধুম।

কানের পাশে বজ্রপাত হলেও অতটা চমকে উঠত না জুড়ান মিস্ত্রির। তার মৃত চোদ্দ পুরুষ যেন অট্টহাস্য করে উঠল। ভয়াবহ তমসাবৃত এই কুটিল মধ্যরাত্রে পিশাচের কানে কে যেন ঈশ্বরের প্রেমনাম উচ্চারণ করল।

: কি কইলা কুসুম? ফিরা কও।

: কুপি ধরাও। ভাত রান্ধুম।

: ভাত?? চাউল পাইলা কই?? তিন দিন অনাহারে আমরা পথ চলত্যাছি, তুমি চাউল পাইল্যা কই? আগো, চাউল পাইল্যা কই?

অনাহারে শীর্ণ, বিশুষ্ক, মুখে দীর্ঘদিন অ-কামানো দাড়ি, জুড়ানের দুই চোখে ধিকি ধিকি অঙ্গার জলে উঠল। বললে, চাউল পাইল্যা ক্যামনে? কথা যে কও না? চাউল আনলা কি দিয়া?

কুসুম এবার কাঁদল। অন্ধকারে তার গালের উপর দিয়ে ভোগবতীর দুই ধারার মতো শুভ্র দুটি রেখা চিক চিক করল। বললে, আগো, তুমি কুপিটা ধরাও। কোথায় চাউল পাইলাম শুইনো না। দুঃখ পাবা।

: আমি শুনুম—জুড়ানের গর্জনে পরাণ দাঁড়িয়ে উঠল। বাবার কাছে এসে দাঁড়াল প্রহরীর মতো। লোকটা ভয়ংকর রাগী। কি করতে কি করে ঠিক নাই।

কুসুম পরাণকে বললে, পরাণ, বয় গিয়া ওইখানে দিদির কাছে। ক্ষিধা পাইছে, বাবা? ভাত খাবি? আচ্ছা, বসো গিয়া। আমি ভাত রান্ধুম অখন।

স্নেহের স্বরে পরাণ ভেঙে পড়ল। তেজী ঘোড়ার মতো এতক্ষণ রুখে ছিল। ঠিক সমানে হেঁটে এসেছে দুই দিন। প্রায় জল ছাড়া কিছুই খায় নি। একমুঠ শুকনো চিড়া মুখে ফেলে জল খেয়েছে দু-বার দুই দিনে।

কিন্তু বাবা মা—কাউকে বিব্রত করে নি। এবার স্নেহের স্বরে মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ন বছরের শিশু ডুকরে কাঁদতে শুরু করল: ক্ষিধায় প্যাট জ্বইল্যা যায় মা। না খাওয়াইয়া আমাগো শ্যাষ দিবা নাকি মা।

: যাও, দিদির কাছে বসো গিয়া। আমি রান্ধি। না খাইয়া আমরা যামু না।

পরাণ দুর্বল শরীরে হরিণশিশুর মতো লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

: চাউল পাইল্যা কই?

: কাইল ভিক্ষা করছি।

: ত'রে আমি খুন করুম—

উদ্যত মুষ্টিতে জুড়ান লাফিয়ে পড়তে চাইল কুসুমের গায়ে। কিন্তু আঘাতের পূর্ব মুহূর্তে উদ্যত মুষ্ঠি আলগা হয়ে সাড়াশির মতো নেমে এল প্রিয়তমা কুসুমের অবয়বে। কী হবে আঘাত দিয়ে? সবই তো শেষ হবে আর কিছু সময় পরে। শরীরের সমস্ত আক্ষেপ দিয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো কুসুমের শরীরটাকে শুধু দুই হাতে আঁকড়ে ধরল জুড়ান। আঘাত দিতে না পারার 'জ্বালা' জুড়াতে চাইল আদরের অত্যাচারে। অদূরে অন্ধকারে দুই পুত্র কন্যা। কিছু ভ্রূক্ষেপ নাই জুড়ানের। কুসুমের বুকে গলায় মুখে পাগলের মতো চুমা খেল। হয়তো বা কামড়াল। বললে, আমারে মাপ কইরো ছোট বৌ। বড়ো সুখের এই জীবন। এই পিরথিমী নিমকহারাম, নির্দয়। রান্ধো। আমি কুপি ধরাই। শ্যাষ রান্ধা রান্ধো।

গাছের ফোকরে কুপি ধরাল জুড়ান। অন্ধকারের সমুদ্রে স্তিমিত আলোকস্তম্ভের মতো কুপির শিখা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠল। সেই মাঝ রাত্তিরে অরণ্যপ্রান্তের প্রান্তরে, গাছের ঢেউ-খেলা শিকড়ে মাটির হাঁড়ি বসিয়ে, অশ্রুর বন্যায় ভাসতে ভাসতে কুসুম ভাত রান্না করল। সেই সামান্য অন্ন ওরা সবাই মিলে ভাগ করে খেল। পরাণ বন্ধুর মতো প্রসন্ন দৃষ্টিতে তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। জুড়ান সেই হাসি দেখে শিহরিত হল। হাসি ফেরত দিতে পারল না।

: এখন হাঁটা দিতে হয়।

: আইজ থাউক। দোহাই তোমার।

: না। চুক্তির খেলাপ কইরো না, কুসুম। হৃদয় বড়ো দুর্বল মানুষের।

পিরথিমীতে আইস্যা' এত অপমানের পরেও আবার সাধ যায় সাইধ্যা লাত্থি খাইতে? মানুষের হৃদয় বড়ো দুর্বল, কুসুম। তুমি হের পর রোজ রোজ ভিক্ষা করবা। স্বামীরে যে কথা দিছ কথা রাখতে পারলা না? মরতে এত ভয় পাও কুসুম?

: আস্তে। ওরা শুনবো।

: আর লুকাইয়া লাভ কি?

: থাউক, থাউক। চলো হাঁটা দি। কত দূর আর তোমার নদী পার। এই হ্যাশে নদী ক্যান ঘরের পাশে নাই? এত কি হাঁটন যায়?

জুড়ান নিঃশ্বাস ছাড়ল। বললে: বড়ো নদীতে যাই আমরা। বড়ো নদীতে শান্তি আছে। নিমেষে সব শ্যাষ। কষ্ট পাবা না। আর এক কোড়শ পথ। আরে, পরাইণ্যা, ওইগুলান থাউক। নিতে লাগবো না। কইলকাতায় অনেক হাড়ি কলসী মিলব। চলো বাবা, তাড়াতাড়ি হাঁটা দিই।

জুড়ানের হাতে মোটা এক লাঠি। শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে একটি তীর্থযাত্রী দল চলেছে অন্ধকারের বুক চিরে। শ্লথ গতিতে অনেকেই পিছিয়ে পড়তে চায়। জুড়ান লাঠি দিয়ে তাড়া লাগায়। হঠাৎ জুড়ান যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। প্রাণে আর ফুর্তি ধরে না তার। মনের আতঙ্ক সে উপরের ফুর্তি দিয়ে ঢাকতে না পেরে শেষে শ্যামাসঙ্গীত ধরল, চোখ বাঁধা কলুর বলদের মতো মা আমায় ঘুরাবি কত—

ভোর হতে এখনও দেরী আছে। উঁচু পাড় থেকে নিচে জলের দিকে তাকালে ভয় করে, মাথা ঘুরে যায়। জলরাশি পোয়াতির মতো শরীরে মোচড় দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে চলে পড়ছে। জল পাক দিয়ে উঠছে। শুশুকের মতো হঠাৎ পিঠ দেখাচ্ছে, মসৃণ হয়ে উলটে পালটে ছুটে চলেছে। বোধ হয় এখানে ঘূর্ণি আছে। এক নিমিষে সব শেষ হতে পারবে।

: শোনো পরাণ, দিদিরে ডাকো। কইলকাতা যাওয়ার ষ্টিমার ধরতে লাগবো। কইলকাতার এক বাবু আইছিল। বাজী ধরছে—কয় কিনা এখানে তিনজন একসঙ্গে সাঁতর দেওয়া শক্ত। তুমি ভালো সাঁতর জানো। পারবা না? বাজী জিতলে কইলকাতা যামু, তুমি ইস্কুলে পরবা। বড়ো

হবা। একটা কথা কই, বাবা। মানুষরে কখনো অপমান করবা না, ঠকাবা না। ভয় পাও নাকি?

শিশু পরাণ উত্তর দিল, না তো। পরমুহূর্তে জিজ্ঞেস করল, সেই লোক কই বাবা? যিনি বাজী ধরছে কইলা—

: নদীর ওই পাড়ে। দূরবীণ কারে কয় জানো? চইক্ষে লাগাইয়া দূরের জিনিস—অনেক দূরের জিনিস দেখন যায়। ওই পাড় থিকা দেখতে আছে।

: মায় কান্দে ক্যান?

: ভয় পাইছে। ডুইব্যা যাবা সকলে, তাই ভয়ে কান্দে।

: দিদি কান্দে ক্যান?

: আরে পোলা, তুমিও দেখি ডরাও। মাইয়ামানুষ কান্দবো না? পুরুষমানুষ কান্দে না। আমি কান্ত্যাছি? তুমি কান্দো? মায়রে জিগাও দড়িগাছ কই রাখল?

বালক পরাণ ক্রন্দনরতা কুসুমের কাছে দড়ির খোঁজে গেল। কোলের শিশুকে বুকে চেপে অধীরভাবে কাঁদছে কুসুম।

কাছে বাবার দিকে পিছন ফিরে কিশোরী বিমলা হাতের পিঠ ডলে চোখ মুছছে, আবার চোখে জল উজিয়ে উঠছে। ওর তেনা-পেঁচানো পিঠ থর থর করে কাঁপছে। সব এখন জলের মতো পরিষ্কার।

কুসুম নদীর কিনারা থেকে উন্মাদিনীর মতো ছুটে এল। বললে, থুইয়া আইছি গাছতলায়। দড়ি আনি নাই।

কাপালিকের দৃষ্টিতে জুড়ান তাকাল কুসুমের দিকে।

: কী? ইচ্ছাটা কি? ভুইল্যাই থুইয়া আইলা? সত্যই কি ভুইল্যা? হারে, মাইয়ামানুষ, কথা রাখতে জান না। খালি ডরাও। এখন উপায়? দড়ি না হইলে বান্ধ্‌বা কিসে?

ওরা আগেই ঠিক করেছিল কোলের শিশুকে জুড়ানের কাছে রেখে মা ছেলে এবং মেয়ে একসঙ্গে দড়ি জড়িয়ে নদীতে ঝাঁপ দেবে। শেষে জুড়ান ঝাঁপ দেবে শিশুকে কোলে নিয়ে! কিন্তু দড়ি আনতেই ভুল হয়েছে। কুসুমের মরবার ইচ্ছা নাই। তাই ভুলে সে দড়ি ফেলে এসেছে। দুঃখের চরম মুহূর্তে, দুর্বলতায়, অঙ্গীকার করেছে মরার, এখন আর কথা ফিরানো যায় না। "সোয়ামী কয়, আমি ডরাই। হায়রে।"

জুড়ান তাকাল কিশোরী বিমলার পরনের তেনার দিকে। দৈর্ঘ্যে জো সুপারির লাগান বুকও ঢাকে না। চোখ ফিরিয়ে তাকাল কুসুমের শাড়ি দিকে। দশ হাত। নিজের ধুতির দিকে তাকাল। শত ছিন্ন।

: শোন। তোমার শাড়ির পাইড় চওড়া আছে। ওই পাশে গিয়া পাইড়টা ছিড়া আনতে পারো? এ ছাড়া উপায় কি কও?

চোখের জল মুছে কুসুম বললে, পারুম। তুমি পিছন ফিরা খাড়াও।

: তাড়াতাড়ি কইরো। রাইত আর বেশি নাই। দিনমানে ভয় পাবা। নদীর পাড়ে লোকজন আসব।

কুসুম ঐ যায় কুরুশ আনতে। খেস্টান পাদরী ফাদার স্যামুয়েল বাড়ুইজ্জা একবার কইছিল, যীশুরে আপন কুরুশ আপন স্কন্ধে বহন করতে অয়। আরও কইছিল, পাপের বেতন মৃত্যু। আমরা কী পাপ করছিলাম গ অঃ!

শাড়ির বিবর্ণ লাল পাড় দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা শেষ করল বুকের কাছাকাছি পরাণ বোধ হয় এবার বুঝতে পারছে। চোখের মধ্যে কেমন একটা অবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠছে। বললে, বাবা, হাতশুদ্ধা বান্ধলা ক্যান। সাঁতর দিমু ক্যামনে?

ও জোর করে পাশে-রাখা হাতদুটো বাঁধন ছাড়িয়ে মাথার উপর তুলল, বাঁধনটা ঠিকমতো বুকের উপর বসাল যেন ব্যথা না লাগে, তারপর শূন্যে দুই হাত নেড়ে দেখল সাঁতর কাটায় কোনো অসুবিধে হবে কিনা।

জুড়ান শিশুপুত্রকে কোলে নিল। ক্রন্দনরতা বিমলিকে বললে, কান্দিস না মা। যদি সাতরাইয়া ওপারে যাইতে পারো, তোমার রাঙা টুকটুইকা পুত্তুরের সঙ্গে বিয়া হবে। প্যাটে সন্তান ধরবা। সুখী হবা। আমারে মার্জনা কইরো মাইয়া। জীবনে অনেক পরীক্ষা দিছি। এই পরীক্ষাখান বাকি ছিল।

বিমলা উত্তর দিল, জানি, বাবা।

জুড়ান কুসুমের দিকে ফিরে বলল, আর ক্যান, কুসুম। এইবার আউগাও।

কুসুম চোখের জল মুছল। স্বামীর পায়ে প্রণাম করার জন্য নিচু হবার চেষ্টা করল। একত্র বাঁধা দড়ির চাপে নিচু হতে পারল না। যুক্তকর কপালে

ঠেকাল। বলল, পোলারে আমার কোলে ছাও। আমি কোলে নিয়া লাফ দিমু। তুমি পুত্রঘাতী হবা ক্যান?

জুড়ান শিশুপুত্রকে কুসুমের কোলে দিল। একটা স্থূল প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো ছয় পায়ে গুটি গুটি দলটা খরস্রোতা নদীর উঁচু টিলার মতো পাড়ের দিকে অগ্রসর হল।

জুড়ান পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল বধ্যভূমিতে ম্যাজিস্ট্রেটের মতো। যন্ত্রণায় ওর মাথা নত, এইবার চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে।

নদীর একেবারে কিনারে এসে দলটা ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকাল। প্রায় হাত পাচেক নিচে কালো জলের রাশি পাক দিয়ে ছুটে চলেছে দ্রুত উড়ন্ত মেঘের মতো। ক্ষুরধার স্রোত। কুটো পড়লে দুখান হয়ে যায়।

আকাশ স্তব্ধ নিথর মেঘে ঢাকা, পৃথিবীর মাথায় কালো কংক্রীটের ছাতের মতো হুমড়ি খেয়ে আছে। যেন মনে হয়, এই পৃথিবী নিরন্ধ্র এক জেলখানা, আলো-বাতাসহীন ছাত যেন একেবারে ঘাড়ের উপর। গাছের পাতা নড়ছে না কেন? পাখিরা ভোরের এই পূর্বমুহূর্তে সূর্যের বন্দনায় নিত্যকার মতো কাকলি করে না কেন? নদীর এই খরস্রোত ভিন্ন আর সবকিছু এত স্তব্ধ, শিহরিত, মূর্চ্ছিতপ্রায় কেন? জীবনের ধ্বনি, কলতান, সঙ্গীত সব বুঝি সমাপ্ত হয়েছে।

এইবার ন বছরের শিশু পরাণ সবই বুঝল। মায়ের বাহু ধরে বলল, আমরা মরতে যাই, না মা?

এক হাতে শিশুকে কোলে চেপে কুসুম অন্য হাতে পরাণের মাথায় আদর করল। বলল, না, বাবা, আমরা বাঁচতে যাই। তোমার ভয় করে?

পরাণ মাকে অভয় দিল, না, মা, এট্টুও ভয় করে না। মরলে কি হয় মা?

: বসুন্ধরার ভার কমে, বাবা। দুঃখ বিনাশ হয়। স্বর্গে গিয়া নিত্য অন্নব্যঞ্জন লাভ হয়। সেখানে মানুষ শুধু হাসে, কান্দে না। আর দেরী না বাবা। আইসো, লাফ দাও।

কোলের শিশুটি তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল ঠিক সেই মুহূর্তে। লজ্জা ভয় সব অতীত। কুসুম সন্তান, স্বামীর সামনেই শিশুর মুখে স্তন গুঁজে দিল। বাছা আমার। বুকে চেপে ধরল প্রাণপণ শক্তিতে। এই ধরণীরে আর বিরক্ত কইরা কান্দে না, বাবা।

শস্য-কুসুমাচ্ছাদিত, সবুজ, শ্যাম, উজ্জ্বল, বহুবর্ণরঞ্জিত শৃঙ্খলিত এই পৃথিবীতে যেন প্রথম ভূমিষ্ঠ নবজাত এক শিশুর প্রতিবাদ ধ্বনিত হল মৃত্যুর বিরুদ্ধে। যোগনিদ্রা থেকে কে যেন বর্শার ফলা বিঁধিয়ে জুড়ান মিত্তিরকে দু-পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল। এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্ন, মায়া এবং মোহের অভিনয় চলছিল। অবাস্তব, অবিশ্বাস্য। রূঢ়তা, ক্রূরতা এবং ঘাতকের পার্ট ওরা ভালো করেছে। সব চাইতে ভালো করেছি আমরা মরার পার্ট। নির্বিরোধ মৃত্যু। বীরতুল্য আত্মহনন। এই যে শিশু ব্রহ্মতেজে তীক্ষ্ণ, তীব্র, আর্তনাদের প্রতিবাদমুখর বর্শা ছুড়ল তাতে আমি শ্রীজুড়ান মিত্তির বিদ্ধ, রক্তাক্ত এবং জাগ্রত হতে পারলাম। আমাকে আমার বাকি পার্টের জন্যে মাপ কোরো।

জুড়ান মিত্তির ছুটে এসে ছয় পায়ের রজ্জুবদ্ধ দলটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। নাগাল পাওয়া যায় না। সেই রক্তাক্ত প্রত্যূষে খরস্রোতা নদীর কুটিল সর্বগ্রাসী জলরাশির উপর দাঁড়িয়ে স্তন্যদানরত অপূর্বমাধুর্যমণ্ডিত কুসুমের মুখমণ্ডল দুই অঙ্গুলিতে তুলে জুড়ান মিত্তির বলেছিল, "এই সোন্দর পিরথিমিতে আমরা মরি ক্যান, কুসুম?"

নৈরাজ্যবাদ॥ অতীন্দ্রনাথ বোস॥ রূপা॥ দশ টাকা॥

বাংলাভাষায় লেখা রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কীয় প্রামাণ্য বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বিশেষ একটি রাষ্ট্রীয় মতবাদ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণ্য বই হিসাবে 'নৈরাজ্যবাদ' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। আড়াই হাজার বছর আগের চীনের 'তাও'বাদ থেকে আরম্ভ করে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগের রাসেল প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের মতবাদের উল্লেখ এবং তার ব্যাখ্যা করে নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদের এক ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবেও বইটির গুরুত্ব যথেষ্ট। অনিবার্য কারণে বইখানি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ করার আগেই লেখকের মৃত্যু হয়। বইখানিকে কেবলমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবে রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। নৈরাজ্যবাদের সমগোত্রীয় একটি রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রণয়ন ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ভূমিকায় একথা বলা হয়েছে:

"নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকের চিন্তা নিয়ে বিভিন্ন পুস্তক রচিত হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর-যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী ভাবনা সংকলিত করে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের এখনও অভাব রয়েছে। লেখক এই অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলেন এবং স্থির করেছিলেন সর্বশেষে তিনি ভাবী সমাজ গঠনের তাঁর এক নিজস্ব পরিকল্পনা দেবেন যাতে গণতন্ত্র ও সমাজবাদের এক বাস্তব সমন্বয়সাধন হয়তো বা সম্ভব। অর্থাৎ, বইখানি শুধুমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে পর্যবসিত না হয়ে হবে একটি নতুন সমাজ-দর্শন। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্তার পূর্ণ পরিণতি আত্মপ্রকাশ করবে এই গ্রন্থে।"

লেখকের এই ঐকান্তিক উদ্দেশ্যের চরিতার্থ রূপ হিসাবে এই গ্রন্থের প্রকাশ হলে হয়তো বাঙালী পাঠক অনেক বেশি উপকৃত হত; হয়তো রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন হত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয় নি। কেবলমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবেই বইখানি প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু কেবলমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হলেও দুটি বৈশিষ্ট্য বইখানির

গুরুত্ব বাড়িয়েছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মতবাদগুলির ব্যা
করা হয়েছে অত্যন্ত সরলভাবে। বক্তব্যের এই সরলতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে
প্রত্যেকটি মতবাদের মূল প্রবক্তার নিজের কথা। বিভিন্ন মতবাদের প্রধ
প্রধান বইগুলি থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি ভাষান্তর করে উদ্ধৃত করা
মতবাদগুলি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন মতবাদের বর্ণনা সংক্ষি
হলেও প্রামাণ্য রক্ষা পেয়েছে।

নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা
হয়েছে। প্রথম বিভাগ-ছুটি কালানুক্রমিক (প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ)।
প্রাচীন যুগের মতবাদগুলির ভেতরে আলোচিত হয়েছে চীনের 'তাও'বাদ
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বর্ণিত নৈরাজ্যবাদের কথা
আর প্রাচীন গ্রীসের সিনিক ও স্টোইক মতবাদের কথা। মধ্যযুগে
পাশ্চাত্ত্য জগতে ধর্মীয় আর রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের মধ্যে যে বিরোধ দেখা
যায়—তার বর্ণনা আছে দ্বিতীয় বিভাগের আলোচনায়। শেষ দুটি বিভাগ
'প্রজ্ঞান যুগ' আর 'বিপ্লব যুগ' বলে সূচিত করা হলেও এখানে কালানুক্রম
বিশেষ নির্দিষ্ট ভাবে অনুসৃত হয় নি। 'প্রজ্ঞানযুগ'-পর্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর
শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি মতবাদের আলোচনা করা হয়েছে—
এই মতবাদগুলির প্রবক্তা হলেন গডউইন, প্রুধঁ ও ম্যাক্স স্টার্নার।
'বিপ্লবযুগ'-এ আলোচিত হয়েছে বাকুনিন, ক্রপটকিন-এর মতবাদ, রুশ
নিহিলিজম, সিণ্ডিক্যালিজম আর আমেরিকার ওয়ারেন, থোরো আর বেঞ্জামিন
টাকারের মতবাদ।

দুই

প্রাচীন যুগে নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কীয় যে সমস্ত মতবাদ দেখা যায় সেগুলির
উৎপত্তি ঐতিহাসিক কারণে হলেও মতবাদগুলির বক্তব্য ইতিহাসাশ্রয়ী না
বাস্তব পরিবেশের প্রতি বিতৃষ্ণ মনের ভাব-কল্পনা রূপায়িত হয়েছে বি
ইতিহাসের বিস্মৃত অবস্থার চিত্ররূপে। দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আ
সামাজিক অনুশাসনের কপটতা উদ্বুদ্ধ করেছিল লাওৎসে আর চুয়াংৎসে
প্রচলিত সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধকে ধিক্কার দিয়ে এক নতুন ধর
মূল্যবোধ-এর কথা প্রচার করতে—যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে মানু
আদিম অকৃত্রিম স্বভাববৃত্তির ওপর। "আধুনিককালের নৈরাজ্যবাদীদের ম

সে (তাও-বাদ) আইন ও শাসন, নীতি ও ধর্ম এ সমস্ত ধ্বংস করতে চেয়েছে। কিন্তু এদের বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ বলে সে মনে করে নি। সে জেনেছে এগুলি সভ্যতার বিকৃতি এবং প্রকৃতির দেওয়া সহজ সততাকে ফিরে পেতে হলে এগুলিকে সমূলে নাশ করতে হবে। প্রকৃতির হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে এক হতে পারলে তবেই তার নিয়মকানুন জানা যায়। তাতেই আনন্দ, তাতেই উন্নতি। এই সার কথাটি তাও-এর সুর—আর সব অসার বাকবিতণ্ডা।" (নৈরাজ্যবাদ: পৃষ্ঠা—১৭)

চীনের তাও-বাদে যেমন নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কীয় একটি মতবাদের সুস্পষ্ট রূপায়ন পাওয়া যায়—ভারতীয় সাহিত্যে তেমন কোনো সুস্পষ্ট মতবাদের প্রণয়ন দেখা যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্বে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের ধর্মশাস্ত্রে—জৈনদের ধর্মগ্রন্থে—এই জাতীয় মতবাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু বেশির ভাগ গ্রন্থেই "অরাজক আদর্শ"কে নিন্দা করা হয়েছে। "ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শনে লোকায়তরা চরম বস্তুবাদ প্রচার করে যেমন অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছিল, রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে উগ্র বিরোধী মত পোষণ করবার জন্য অরাজকদেরও সেই দশা হল।…দণ্ডনীতির ধারকরা বিপক্ষের নিন্দাবাদ করবার জন্যে অরাজক ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন—এই কটূক্তি থেকেই জানা যায় যে অরাজক মতবাদটা একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না।" (পৃষ্ঠা—২০)

বিভিন্ন শাস্ত্রে যদিও নৈরাজ্যবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে—তবুও 'অরাজক মতবাদ' যে কেবলমাত্র উপেক্ষণীয় ছিল না—তা নয়; ভারতের তৎকালীন ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে নৈরাজ্যবাদের অনেক ভাবসূত্রই সমাজব্যবস্থায় অনুসৃত হয়েছে। "রাষ্ট্র এখানে এক সর্বশক্তিমান দানবীয় আকার ধারণ করতে পারে নি। তার শক্তি ছিল বহুধা বিকেন্দ্রিত। …এই সমস্ত গোষ্ঠী এবং কুল, বর্ণ, রাষ্ট্র ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হত রাজবিধান দিয়ে নয়, শাস্ত্রবিধান দিয়ে।…সমাজকে শাসন করত দণ্ড নয় ধর্ম। রাষ্ট্রবাদীরা ধর্মকে দণ্ডের কবলে আনতে চেয়েছিল। তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনে এইটুকুই নৈরাজ্যবাদীদের সার্থকতা।" (পৃষ্ঠা—২৪)

পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় বিভিন্ন ভাবাদর্শ প্রথম রূপায়িত হতে থাকে গ্রীক

চিন্তাধারায়। গ্রীক চিন্তাধারাতেই নৈরাজ্যবাদের মূল ভাবনাগুলির প্রথম আভাস পাওয়া যায়। প্রধানত সিনিক ও স্টোইকদের মতবাদেই এই ভাবনাগুলি দেখা যায়। ভারতবর্ষে যেমন লোকায়ত আর অরাজক মতবাদকে অনেক বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে—সিনিক আর স্টোইক মতবাদও তেমনি বিকৃতরূপে প্রচারিত হয়েছিল বিরুদ্ধ মতবাদের পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা।

'সিনিক' দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান দুজন হলেন এনটিস্থিনিস আর তাঁর প্রধান শিষ্য ডায়োজিনিস্। গ্রীক গণতন্ত্রের অসারবত্তা, নগররাষ্ট্রের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব এবং নগররাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় নাগরিকদের বিশেষ সুবিধাভোগ ইত্যাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এঁরা রাষ্ট্রের ধারণাটির প্রখর সমালোচনা করেছেন এবং প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। 'আইন ও কমনওয়েল্থ্ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে এনটিস্থিনিস্ "গ্রীকদের ধোপদুরস্ত নৈতিক সংস্কার ও আদবকায়দার সঙ্গে আদিম বর্বরদের স্বভাবসঙ্গত সুখী জীবনের তুলনা করেছেন। এ হিসেবে তিনি প্রকৃতিবাদী রুশোর পূর্বসূরী। গ্রীক চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনিই প্রথম, যার ধ্যানমানসে ফুটে উঠেছিল অতি পুরাতন নিরাজ সমাজের ছবি, যাতে প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে শাসনহীন বন্যমানুষ ভরা জীবনের আনন্দে বিচরণ করছে।" (পৃষ্ঠা—২৮)

স্টোইকদের রাষ্ট্রচিন্তার আশ্রয় হল তাদের ভগবত তত্ত্ব। এঁদের মতে জ্ঞানীয় অথবা নৈতিক সমস্ত আদর্শের উৎস ব্যক্তি। কারণ ব্যক্তির মধ্যেই ভগবৎ সত্তার প্রতিফলন রয়েছে। ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি তাই রাষ্ট্রের সমষ্টিগত বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে স্টোইকরা ব্যক্তিবাদী হলেও আরেকদিক থেকে দেখতে গেলে তাঁরা বিশ্ববাদী। কিন্তু এই দুই-এর ভেতর কোনো বিরোধ ছিল না। "কারণ ব্যক্তি ও বিশ্বে কোনো বিরোধ নেই।...যেহেতু প্রজ্ঞান বিশ্বব্যাপী ঐশ্বরিক জিনিস সে-হেতু একজনের প্রজ্ঞান-লব্ধ বিচার অপরের থেকে পৃথক হতে পারে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মূলত একই রকমের কারণ তাঁদের ইচ্ছা এক, অধিকার সমান।" (পৃষ্ঠা ৩৪)

তিন

প্রাচীন গ্রীসের সিনিক ও স্টোইক মতবাদের সঙ্গে মধ্যযুগে বিভিন্ন নৈরাজ্য-বাদী মতামতের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় রোমান স্টোইকদের মতবাদে।

এঁদের মধ্যে সেনকো আর এপিকৃটেটাস হলেন অন্যতম। সেনকোর মতে পৃথিবীতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীই চূড়ান্ত শাসক নন। পৃথিবীতে একই সঙ্গে ঈশ্বরের এবং রাজার শাসন বর্তমান। যীশু খ্রীষ্টর চিন্তাতেও অনুরূপ মতের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি পুরোপুরি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। তাঁর মতে "পার্থিব শাসন ও ঐশ্বরিক শাসন উভয়ের সহ-অস্তিত্ব সম্ভব।" কিন্তু উভয়ের সহ-অস্তিত্ব সম্ভব হলেও খ্রীষ্টের মতে পার্থিব শাসনের উৎপত্তি পাপ থেকে। রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে তাঁর বিরোধ না থাকলেও—তার প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। "কিন্তু এই উপেক্ষার মধ্যেই ছিল কম্যুনিজম ও এনার্কিজম-এর বীজ।" (পৃঃ ৪৫) সেন্ট অগাষ্টিনের "ঈশ্বরের নগরের পরিকল্পনায় পার্থিব শাসনের প্রতি ধিক্কার আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পার্থিব শাসনের উৎপত্তি পাপ থেকে। পাপকে সংযম করে যন্ত্রণা লাঘবের জন্য শাসনের প্রয়োজন হল। শাসনের দায় নিল রাষ্ট্র—'পৃথিবীর নগর'। যার জন্ম ও স্থায়িত্ব মানুষের বিকারে তা কখনো শুভ হতে পারে না।" (পৃঃ ৪৭)

পরবর্তীকালে মানবসমাজকে খ্রীষ্টানজগতের সঙ্গে এক করে ফেলা হল। যে-হেতু পার্থিব শাসন শুভ নয়—কাজেই ধর্মীয় শাসন পার্থিব শাসনের উর্ধ্বে। যিনিই ধর্মনায়ক—তিনি রাষ্ট্রনায়কও বটে। "কিন্তু ধর্মনায়ক নিজ হাতে রাজদণ্ড ধারণ করেন না...বাহ্যত রাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র থেকে পৃথক হলেও মূলত ধর্মতন্ত্র থেকেই এর উৎপত্তি।" (পৃঃ ৫০)

"মধ্যযুগের চার্চ ও স্টেটের দ্বন্দ্ব নিরাজবাদী ও রাষ্ট্রবাদীর দ্বন্দ্ব নয়, দুই প্রভুত্বলোভী লৌকিক সঙ্ঘশক্তির দ্বন্দ্ব। খ্রীষ্টান ধর্মোন্মাদনার চরম অবস্থায় চার্চ স্টেটকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল।...সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম-বিশ্বাসের যুগে নৈরাজ্যবাদীর সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে স্টেটের বিরুদ্ধে নয়, চার্চের বিরুদ্ধে।" (পৃঃ ৫১)

ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ইউরোপে মধ্যযুগে যে সমস্ত আন্দোলন দেখা যায়—তার মধ্যে ফ্রান্সের এলবিজেন্সিয়ান বিদ্রোহ, জার্মানীর কৃষাণ বিদ্রোহ, এনাব্যাপটিস্ট আন্দোলন অন্যতম। ধর্মীয় কর্তৃত্বের সর্বাত্মক শাসনের বিরুদ্ধে আর ঘোষণা করলেন ব্যক্তির বিবেকের মুক্তি। ধর্মীয় বিশ্বাস আর আচার অনুষ্ঠানের বিষয়ে রাষ্ট্র অথবা ধর্মীয় কর্তৃত্ব কারোরই কোনো এক্তিয়ার নেই।

তত্ত্বের দিক থেকে এনাব্যাপটিস্ট বা তাঁদের সমগোত্রীয়েরা নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। রাষ্ট্রকে তাঁরা সরাসরি ধ্বংস করতে চান নি। কিন্তু প্রত্যক্ষ

ভাবে বিনাশ না চাইলেও এঁরা রাষ্ট্রের যে রূপ কল্পনা করেছেন বা সাধারণ রাষ্ট্রকে যেভাবে পরিবর্তিত করতে চেয়েছেন—তাতে সাধারণ অর্থে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

চার

"সতের-আঠার শতকের জনবিদ্রোহ ছিল প্রধানত রাষ্ট্র-শাসনের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহীদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন বটে, তারা রাষ্ট্রের আশ্রিত ধর্ম, বিত্ত এবং স্থিত স্বার্থকেও আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন সফল হয় নি।...সুতরাং আবার শুরু হল তীর্থযাত্রা সাম্য ও স্বাধীনতার অন্বেষণে। ধর্মবিপ্লব আঘাত করেছিল চার্চের কর্তৃত্বকে, রাষ্ট্রবিপ্লব রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে।...ধর্মীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য প্রটেস্টান্ট আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসেছিল উগ্রপন্থী এনাব্যাপটিস্টরা; তেমনি রাষ্ট্রীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য জ্যাকবিন দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এনার্কিস্টরা।...রাষ্ট্রের পোষ্যবর্গের সঙ্গে সঙ্গে তারা ধর্ম, বিত্ত ও শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হল।" (পৃঃ ৭০)

প্রাচীন যুগে নৈরাজ্যবাদ যদি হয় স্বপ্নসাধ, মধ্যযুগে নৈরাজ্যবাদ যদি হয় ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি—তবে 'এনার্কিজম' হল তাত্ত্বিক বিচারে পরীক্ষিত সমাজদর্শন। প্রজ্ঞানশীল নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইংল্যাণ্ডের উইলিয়ম গডউইন, ফ্রান্সের প্রুধঁ আর জার্মানীর ম্যাক্স স্টার্ণার।

গডউইনের মতে "আমাদের সমাজজীবনে ছেয়ে আছে এমন সব নীতিবোধ ও নিয়মকানুন যার সঙ্গে ন্যায়ধর্মের সঙ্গতি নেই, যা বস্তুত অন্যায়"। (পৃষ্ঠা ৭২) শেলীর 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড'—গডউইনের নৈরাজ্যবাদে যে হৃদয়বৃত্তির অভাব ছিল—তা পূরণ করল। আর ওয়েনের সমাজবাদী চিন্তায় এই নৈরাজ্যবাদ আরও পুষ্টরূপে প্রকাশ পেল। গডউইন-এর নৈরাজ্যবাদ আর ওয়েনের সমাজবাদ সমন্বিত হল ফরাসী দার্শনিক প্রুধঁর মতবাদে। "গডউইন ও প্রুধঁর মূল্যবিচারে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সমাজ নিষ্পাপ, রাষ্ট্র যত নষ্টের মূল।...যে দেশে যেমন মানুষ সে দেশে তেমন সরকার, তেমন জনসংঘ, তেমন পৌরসভা। কাঠামো বদলালে মানুষ বদলায় না, প্রশাসনের সংস্কার হয় না। গডউইন ও প্রুধঁ উভয়ের বিশ্বাস ছিল যে বুদ্ধির বিকাশ হলে সব দোষ শুধরে যাবে।" (পৃঃ ১১১-১১২)

ম্যাক্স স্টার্ণারের নৈরাজ্যবাদ কেবল সামাজিক কর্তৃত্বের অপচয় অথবা দূষিত সমাজরূপের বিরুদ্ধেই নয়; মানুষের সামাজিক সম্বন্ধকেই তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন। গডউইন বা প্রুধঁ ব্যক্তিবাদী ছিলেন। কিন্তু এঁরা ব্যক্তির সমস্ত রকম সামাজিক সম্বন্ধকে অস্বীকার করেন নি। "গড-উইনের ব্যক্তি অপরের কল্যাণে সার্থক, প্রুধঁর ব্যক্তি অপরের সঙ্গে সহযোগে সম্পূর্ণ স্টার্নারের বিধানে জাষ্টিস ও ম্যতুয়ালিতের জায়গা নেই, বিত্তের বিভাগ শ্রমের সংগঠন ইত্যাদি অবান্তর প্রশ্ন।" (পৃঃ ১৩৮)

পাঁচ

যে সময়ে ফ্রান্সে প্রুধঁ আর জার্মানীতে ম্যাক্স স্টার্নারের মত উদ্ভূত হয়েছিল—প্রায় সেই সময়েই রাশিয়ায় মাইকেল বাকুনিন নৈরাজ্যবাদের প্রচার এবং আন্দোলন শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ায় রাজনৈতিক চেতনার এক বিশিষ্ট অংশ জুড়ে রয়েছে নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারা। বাকুনিনের নৈরাজাবাদী চিন্তাধারায় প্রধানত তিনজনের প্রভাব দেখা যায়—ফয়েরব্যাক, মার্কস ও প্রুধঁ। তবে এঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল প্রুধঁর। এবং মার্কসের চিন্তাধারার কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ বিরোধ। তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার বদলে বাকুনিন কল্পনা করেছেন এক যুক্তরাষ্ট্রের—সেই যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে হবে নিরাজ গণতন্ত্র। নৈরাজ্যবাদী দর্শনে বাকুনিনের মৌলিক অবদান তেমন কিছু নেই। "কিন্তু কে অস্বীকার করবে একথা যে তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ও নিরলস সংগ্রাম নৈরাজ্যবাদকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে, পণ্ডিতের আসর থেকে নিয়ে এসেছে যোদ্ধার কুরুক্ষেত্রে, দার্শনিকের মিনার থেকে নামিয়ে এনেছে পথে-ঘাটে বস্তিতে পল্লীতে?" (পৃঃ ১৭৭) বাকুনিনের বিপ্লবাত্মক মতবাদ উনিশ শতকের রাশিয়ায় নিহিলিস্টদের অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিল। বাকুনিনের পরে রাশিয়ার আরও একজন নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারাকে পুষ্ট করে তোলেন—আলেকজান্দার ক্রোপোটকিন। "ক্রপটকিনের লেখায় একটা অনবদ্য প্রাঞ্জলতা আছে যা প্রুধঁর রচনায় নেই, যুক্তি ও তথ্যের গাঁথুনি আছে, বাকুনিনে যার অভাব।" (পৃষ্ঠা ২০৫) এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধে ক্রপটকিন লিখছেন যে "নৈরাজ্যবাদী দর্শনে তাঁর প্রধান অবদান একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস।" (পৃষ্ঠা ২০৬) ক্রোপোটকিনের নৈরাজ্যবাদে তিনটি

ক্ষমতার হাত থেকে মুক্তির কথা দেখা যায়—ধনতন্ত্রের কবল থেকে উৎপাদনে মুক্তি, সরকারী শাসন থেকে মুক্তি আর ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র থেকে মুক্তি। প্রুধঁ প্রভৃতির নৈরাজ্যবাদ ও মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব যুক্ত হয়েছে ফরাসী সিণ্ডিক্যালিস্টদের মতবাদে। নৈরাজ্যবাদ থেকে পৃথক হলেও প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে এঁদের মন্তব্যগুলি নৈরাজ্যবাদীদের মতোই।

ইউরোপে নৈরাজ্যবাদের উদ্ভব হওয়ার প্রায় কিছু আগে থেকেই আমেরিকার ম্যাসাচুস্টেসে নৈরাজ্যবাদী ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ পায় যোসুয়া ওয়ারেন-এর মতবাদে। ওয়ারেন ছাড়া আমেরিকার নৈরাজ্যবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন আরও দুজন—থোরো আর টাকার। ওয়ারেনের চিন্তাধারায় সমাজবাদের কোনো কথা ছিল না। তার নৈরাজ্যবাদে ব্যক্তিসর্বস্ব নিঃশাসন সমাজের চিত্র রূপায়িত করা হয়েছে। থোরোর মতে স্বৈরতন্ত্র, লোকনি রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্রমশ এগোচ্ছে ব্যক্তিপরায়ণতার দিকে। কিন্তু গণতন্ত্রই চরম অবস্থা নয়—এর পরে আস উচিত নিরাজতন্ত্রের।

ছয়

নৈরাজ্যবাদের অন্তর্গত বিভিন্ন মতবাদগুলির বক্তব্যগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তবুও যে রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রয়োগ-সিদ্ধ নয়—সেই ধরনের মতবাদগুলির আলোচনা ইতিহাসাশ্রয়ী না হয়ে—তত্ত্বগত হলে তাদের ভাববৈশিষ্ট্যগুলি সুনির্দিষ্টভাবে ধরা পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থে সে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নি। বিভিন্ন মতবাদগুলিকে একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্রে গ্রথিত করে উপস্থাপিত করায় সেগুলির তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয় নি; অথচ, শুধুমাত্র নৈরাজ্যবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টার ফলে বিভিন্ন মতবাদগুলির ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটিও সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট হয় নি। 'প্রজ্ঞানযুগ' আর 'বিপ্লবযুগ' এই দুই ভাগে যে সমস্ত মতবাদের আলোচনা হয়েছে সেই মতবাদগুলি সম্পর্কে ওপরের কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উনবিংশ শতাব্দী ও তদুত্তর সময়ের সামাজিক-ঐতিহাসিক চিত্রপট অত্যন্ত জটিল এবং সুবৃহৎ। কাজেই এই সময়ের যে-কোনো সামাজিক ভাবাদর্শকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করতে হলে প্রশস্ততর পটভূমি বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। অন্যথায়—সেই ভাবাদর্শের মূল বক্তব্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

ভূমিকায় বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবে বইখানি রচনা করার উদ্দেশ্য ছিল না; যদিও লেখকের উদ্দেশ্য যথাযথ চরিতার্থ হয় নি। তবুও বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী মতবাদের বক্তব্য বলার সময় লেখক দুই-একটি মন্তব্য করেছেন মাঝে মাঝে, যেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু যে-হেতু এ ধরনের মন্তব্য তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ হওয়াই সঙ্গত, রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে যাঁদের নির্দিষ্ট ধারণা নেই—তাঁদের কাছে এ ধরনের মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁদের কিছু ধারণা আছে তাঁদের কাছে—এ ধরনের মন্তব্য যথাযথ সন্নিবিষ্ট নয় বলেই মনে হবে।

বইটির সবশেষে সমীক্ষণ বলে একটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদটি নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। সম্ভবত লেখক এই পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ করার সুযোগ পান নি। অন্তত এই পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণরূপে পেলেও পাঠক যথেষ্ট উপকৃত হতেন। এই অংশের প্রথম দিকে নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে দুজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতামতের উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা হলেন প্লেখানভ ও শ। বাকুনিনের মতবাদের সমালোচনা (প্লেখানভ কর্তৃক) উদ্ধৃত করে তার প্রতিসমালোচনা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বরং এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্লেখানভের প্রসঙ্গের অবতারণা করে লেখক মার্কসবাদকে কটুকথা বলার সুযোগ করে নিয়েছেন। এ বিষয়ে লেখকের কথাগুলি কতখানি বিচারসিদ্ধ এই প্রশ্ন না তুলেও বলা যেতে পারে যে এ-ধরনের বক্তব্য জোর করে টেনে আনা হয়েছে। নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে শ-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করে লেখক যে সমস্ত কথার অবতারণা করেছেন সেগুলির প্রাসঙ্গিকতাও সহজবোধ্য নয়। হয়তো প্লেখানভ এবং শ-এর মন্তব্যের আলোচনা করে লেখক মার্কসবাদ, নৈরাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সে চেষ্টাও যথেষ্ট সার্থক হয় নি। সাধারণভাবে নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য এই অংশে লেখক করেছেন—সেগুলিও তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। তত্ত্ব হিসাবে বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী মতবাদগুলির লক্ষণ কি কি—সেগুলি নির্দেশ না করা হলে—যথাযথ সমীক্ষণ সম্ভব নয়।

গৌতম সান্যাল

মৃণাল সেনের "প্রতিনিধি"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শিল্পীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বভাবের পর্দা উঠিয়ে মানুষের অন্তরের লীলাকে উদ্ঘাটিত করা, শুধুমাত্র স্বভাবকে নকল করা নয়। মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেন যে বাস্তবের নির্জলা দাসত্ব শ্রেষ্ঠ শিল্পের চরিত্র নয়। চলচ্চিত্রকে যারা শিল্পসম্মান দিতে নারাজ—তাদের বক্তব্যের মূল কথা হল এই যে হয় তা বাস্তবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কর্মক্লান্ত অল্পবুদ্ধি দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য শস্তা স্বপ্নজগৎ তৈরি করে—কিংবা বড়জোর বাস্তবের নকলনবীশী করে। অধিকাংশ ছবি—বিশেষ করে ভারতীয় ছবি যে এর বেশি দূরে যেতে পারে না তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু যখন কোনো ছবি সত্যি সত্যি অস্তিত্বের মর্মমূলকে স্পর্শ করতে পারে তখন দর্শক হিসাবে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করি। মৃণাল সেনের 'প্রতিনিধি' আমাদের মধ্যে সেই উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

আমাদের মধ্যে একটা অভ্যাস চালু আছে শিল্পকর্মে পটভূমিকা ও মূলশিল্পবস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ধোঁয়াটে ধারণা নিয়ে অযথা বাজে তর্ক তোলা। 'চার অধ্যায়ে' রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদকে গালাগাল দিয়ে কতটা অন্যায় করেছেন, নারীস্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে অতএব "পুতুলখেলা"র অভিনয় করা আর উচিত কিনা, "কাঞ্চনজঙ্ঘা"-তে সত্যজিৎ রায় নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে কতটা ওকালতি করেছেন—এই সব প্রশ্ন নিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎসাহে নৈয়ায়িক আলোচনায় আমরা মাতি—শিল্পকর্মের প্রাণকেন্দ্রকে প্রায় বিস্মৃত হয়ে। "প্রতিনিধি"র বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় নি। একদল বলেছেন বিধবাবিবাহ বিদ্যাসাগরী আমলের 'টপিক' তাই নিয়ে এত মাতামাতি কিসের—আরেক দল বলেন এসব আমাদের সমাজে চলে না। প্রথম এ-জাতীয় আলোচনাকে গুরুত্ব দিলেও সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় বিধবাবিবাহজনিত সমস্যা এখনও আমাদের জীবনে আধুনিক সমস্যা—বিদ্যাসাগর একে আদর্শগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেও এখনও আমাদের সমাজে এটা সহজ হয় নি। ঠিক যেমন ইবসেনের নোরার সমস্যা এখনও আমাদের আধুনিক সমস্যা, (সেটা যথেষ্ট টের পাওয়া যায় পুতুলখেলার অভিনয়কালে তৃপ্তি মিত্র যখন শেষদৃশ্যে সিঁথির সিঁদুর মোছেন), এমন কি 'মহানগরে'র আরতির সমস্যাও—ডালহৌসী স্কোয়ারে মেয়েদের উপস্থিতি সত্ত্বেও একথা সম্পূর্ণ সত্যি, কেননা তত্ত্বগতভাবে নারীস্বাধীনতার বুলি আওড়ালেও পুরুষ প্রভাবিত সমাজের পুরাতন মূল্যবোধ এখনও আমরা আঁকড়ে আছি—অনেকটা ঐ টাইবাঁধা পুরুষসিংহের সত্যনারায়ণের সিন্নি খাওয়ার মত ব্যাপার।

কিন্তু এ বাহ্য। "প্রতিনিধি" ছবিতে মৃণাল সেনের মূল উদ্দেশ্য বিধবা-বিবাহের নৈতিক বিচার নয়—তার উদ্দেশ্য নরনারীর সম্পর্কের নিবিড়

প্রদেশের উদ্ঘাটন—এবং বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব থেকে সঞ্জাত ট্র্যাজেডির রূপায়ণ (মৃণাল সেন স্বয়ং একথা বলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি একথাকে প্রকাশ করছি)। নাটকীয় সংঘাতের উপযুক্ত সামাজিক পটভূমিকা হিসাবেই তিনি বিধবা-বিবাহসমস্যার নির্বাচন করেছেন এবং সে নাটকীয় সংঘাত রচনায় বিধবার পূর্বপক্ষের শিশুপুত্র 'catalytic agent'-এর কাজ করেছে এইমাত্র। কিন্তু মূল কথা হল দুটি নরনারীর adjustment-এর সমস্যা এবং তাদেরই চরিত্র থেকে উদ্ভূত কারণে সে বোঝাপড়ার বিফলতা—তাই থেকে নিঃসঙ্গতা—সে নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্য ব্যর্থ চেষ্টার ট্র্যাজেডি।

আলার্ডাইস্ নিকল গ্রীক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেছেন যে বাইরে থেকে নাটকের গতি যদিও 'Fate'-কে নির্ধারণ করতে দেখা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় "character is destiny". সত্যিকারের ট্র্যাজেডির স্রষ্টা চরিত্ররা নিজে বাইরের কোনো ঘটনা নয়। "প্রতিনিধি"র ট্র্যাজেডি সম্পর্কে সেকথা প্রযোজ্য। রমার অপরাধবোধ, দুর্বলতা, লজ্জা, নীরেনের চরিত্রেও কোথাও দৃঢ়তার অভাব—ওদের পারস্পরিক সম্পর্ককে গোড়া থেকেই ধীরে ধীরে দুর্বহ করেছে পরস্পরের পক্ষে, নাহলে "একটা বাচ্চা ছেলেকে দুটো বুড়োধাড়ি মানিয়ে চলতে" পারত।

আধুনিক জীবনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের চিত্রণে মৃণাল সেন অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন—চাপা সংঘাত রচনায় এ ছবি এমন একটি শিল্পমানের সৃষ্টি করেছে—যা বাংলা ছবিতে খুব কম দেখা গেছে—শুধুমাত্র "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র কথা বার বার মনে পড়ে। Polanski-র "Knife in the Water" বা Antonioni-র ছবিতে (দেখি নি—পড়েছি)-এর সাধর্ম্য মেলে এবং মৃণাল সেন স্বয়ং বলেন যে পাঠমারফত Antonioni-র শিল্পকর্ম তাকে প্রেরণা দিয়েছে। গভীর রাত্রে বিছানায় স্বামীর কাছে স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা জ্ঞাপন এবং সেই নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য চাকরি করতে চাওয়া—স্ত্রীর মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশে স্বামীর ক্রোধ ও বিরক্তির বিস্ফোরণ—মনের রাগকে শরীরী প্রকাশ দেবার জন্য ঘড়ির চাবি দেওয়া,—কিংবা বর্ষার রাত্রে পাশের ঘর থেকে ছেলের ডাকে স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় আলিঙ্গনের আকস্মিক বিচ্ছেদের ভয়াবহতা, ছেলেকে লুকিয়ে জন্মদিনের উপহার দিতে যাবার আগে শাড়িবদলের দৃশ্য, নীরেনের মনোবেদনা—বাসের দৃশ্যকোণ থেকে দেখা চলমান কলকাতা, কিংবা স্কুল থেকে ছেলেকে চুরি করে নিয়ে আসবার সময়ে ট্রামের দৃশ্যকোণ থেকে নেওয়া দ্রুতগতিতে অপসৃয়মান পথের দৃশ্য, হাসপাতালের ছিমছাম ভাবালুতাবর্জিত দৃশ্য, কিংবা মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার দৃশ্যের অপূর্ব সংযম, বন্দুক পরিষ্কার করার সময় শিশুটির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপনের দৃশ্য, শিশুটির অপূর্ব অভিব্যক্তি—এ সবই খুবই উচ্চমানের শিল্পকৃতির পরিচায়ক। কিন্তু আগাগোড়া ছবিটিতে এই উচ্চমান রক্ষিত হয় নি। রমার

আগেকার শ্বশুরবাড়ির এপিসোডগুলি, কিংবা পাশের বাড়ির "গ্রাম্য লোক'-গুলির অনাবশ্যক উপস্থিতি যে শুধুমাত্র ছবিটির শিল্পগত ঐক্যকে বিঘ্নিত করেছে তাই নয়, ঐ সকল অংশের অভিনয় এবং রূপায়ণ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের এবং ওখানে আমাদের গতানুগতিক বাংলা 'বই' উঁকি মারছে। শুধুমাত্র ট্রেনের আওয়াজের ওপর টাইটেলটি চমৎকার কিন্তু তার আগের পূর্বকথনের অংশটুকু সুনির্মিত হলেও অপ্রয়োজনীয়। এ সবের উপস্থিতি হয় সম্ভবত দর্শকদের সামনে ব্যাপারটিকে যথেষ্ট পরিমাণে সহজগ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করা—যেমন শয্যাগৃহে রমার মুখের কিছু কিছু সংলাপ (বাড়ি ছাড়লাম—চাকরি পেলাম—গেলাম গিরিডি), কিন্তু ছবিটির অসামান্য 'ইকনমি'র পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো বেশ অস্বস্তিকর মনে হয়—অথচ শয্যাতে রমার 'মেমরি-ফ্ল্যাশব্যাক'গুলি অসাধারণ। ছবিটির শেষাংশও কিছু পরিমাণে এর মৌল শিল্পমান থেকে বিচ্যুত। আত্মহত্যাতে নীতিগত ভাবে আপত্তি করবার কিছু নেই—মহৎ-সাহিত্যে আত্মহত্যার সম্মানিত স্থান আছে এবং মৃত্যু মানেই গল্পের জোড়াতালি দেওয়া নয়। কিন্তু তার জন্য চাই উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি—যার অভাবে এ জাতীয় ঘটনা বহিরাগত আকস্মিকতা আনে যা এ জাতীয় চরিত্রকেন্দ্রিক ছবিতে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। মৃণালবাবু গল্পের ভূমিকা-পর্বকে নির্মমভাবে ছেটে যদি আরো কয়েকটি সিকোয়েন্স মারফত ওদের সম্পর্কের ভেতরকার ভয়াবহতাকে এবং রমার অসহায়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতেন—তবে আত্মহত্যাকে যেটুকু আকস্মিক বলে মনে হয় তা হত না। একেবারে ক্লোজিং শটে নীরেনের কোলে বাচ্চাটির বসে থাকার দৃশ্যটি sentimental এবং সেজন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুপযুক্ত মামুলী সঙ্গীত রচনা অনেকটা দায়ী। এসব কারণে ছবির শেষ সম্পর্কে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। এর বিকল্প কি ছিল—"আন্তনিয়নি-কায়দায়" অনিষ্পত্তির মধ্যে ছবিটা শেষ করা উচিত ছিল কিনা এবং তাতে ট্রাজিক গভীরতা বৃদ্ধি পেত কিনা—এসব আলোচনা করে বিশেষ লাভ নেই—এবং এ-সম্পর্কে শিল্পীকে কোনো রকম ফতোয়া জারি করা অর্থহীন—তবে যে অবস্থায় আমরা ছবিটিকে পাচ্ছি তা আমাদের শিল্পবোধকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করে কিনা সম্ভবত এইটুকুই আমরা বলতে পারি—সেদিক থেকে বলা যায় ছবিটির শেষ নিষ্পত্তি ছবিটির আসল শিল্পমানের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম।

কিন্তু এ ছবিতে পরিচালক অস্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন—এবং অভিনেতাদের আন্তরিকতা, বিশেষ করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসেনজিতের চমৎকার অভিনয় পরিচালককে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। "প্রতিনিধি" সাম্প্রতিক বাংলাচলচ্চিত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ শুভসূচনা করছে এই কারণে যে এর ফলে আশা হয় সত্যজিৎ রায় হয়তো আর নিঃসঙ্গ নাও থাকতে পারেন।

স্বর্ণকমল স্মরণে

স্বর্ণকমল নেই। রোগপাণ্ডুর সেই হাসিমুখটি হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল! হাজার হাজার মানুষের মতো জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে স্বর্ণ এসেছিল এই কোলাহলময় মহানগরীতে। এই মহানগরীতে সে হারিয়ে গেল।

স্বর্ণকমল এ যুগের মানুষ, কমিউনিস্ট। শুধু পুঁথি পড়ে নয়, জীবনের ঘাটে ঘাটে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ধাক্কা খেতে খেতে স্বর্ণ কমিউনিস্ট হয়েছিল এবং প্রত্যয়সিদ্ধ কমিউনিস্ট। কোনো ঝড়ঝাপটায় টলে নি, কোনো বিপদে ভয় পায় নি।

পরাধীনতার বেদনা তার বুকে বেজেছিল, সেই বেদনা থেকেই তার পথের সন্ধান শুরু হয়। কারাবরণ করেছে, দুঃখকষ্টে জীবন কাটিয়েছে আর তারই মধ্যে চলেছে তার জীবনের পাঠ নেওয়া। পাঠ নেওয়া তার সার্থক হয়েছিল। কর্মক্ষেত্রে ফলটা দাঁড়িয়েছিল খারাপ, কারণ, জীবনের পাঠ নিয়ে যে পথ বেছে নেয় এ সমাজে তার ঠাঁই হওয়া কঠিন। তাই স্বর্ণও ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে, আজ এখানে, কাল ওখানে। ১৯৩৫ সালের ১লা মে স্বর্ণ, আমি এবং শচীন রক্ষিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় শিক্ষানবীশ-সাংবাদিকরূপে ঢুকি। কিছুকাল পরেই স্বর্ণকে বিদায় নিতে হল, তারপরই শচীনকে। স্বর্ণর খারাপ স্বাস্থ্য ছিল কর্তৃপক্ষের অজুহাত। মাখনবাবু তখন সর্বেসর্বা। তিনি চান 'লৌহদৃঢ় স্বাস্থ্য'। স্বর্ণ তিক্ত হাসি হেসে বলেছিল, "খেতে না পেলে আর স্বাস্থ্য আসবে কোথা থেকে?" তাতে মাখনবাবুর মন গলে নি। ক্ষুব্ধ স্বর্ণকমল সংবাদপত্রের ম্যানেজারদের তীব্র কষাঘাত করে তার 'অন্ত্যেষ্টি' উপন্যাস রচনা করেছিল ঠিক এই ঘটনার পরেই। যাঁদের সে কষাঘাত করেছিল তাঁরা আজও অনেকে বেঁচে আছেন, কিন্তু স্বর্ণকমল চলে গেছে।

টিউসনি, প্রুফ দেখা, পত্রিকা-পরিচালনা—কতরকম কাজ যে স্বর্ণকে করেত হয়েছে জীবিকা অর্জনের জন্যে তার ঠিক নেই।

'যুগান্তর' যখন বেরোয় তখন স্বর্ণকমল সেখানে কাজ পেয়েছিল। কিন্তু সময়মতো মাইনে না দেওয়া ইত্যাদি নানা কারণে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধল। শেষ পর্যন্ত স্বর্ণকমল, সুরেন লাহিড়ী প্রভৃতির

নেতৃত্বে হল কলম-ধর্মঘট (সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রথম কলম-ধর্মঘট)। কর্তৃ
আপস করলেন বটে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যে স্বর্ণকমল ও আরও কয়েকজ
চাকরি গেল।

আবার জীবিকার সন্ধান, আবার লড়াই। যুদ্ধের সময় গ্লোব এজেন্সী
'অরণি'তে এবং পরে কিছুকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কাজ করার প
আবার স্বর্ণকমল ভেসে বেড়িয়েছিল। এরই মধ্যে চলে বই-লেখা। 'স্বাধীনতা
প্রকাশিত হলে স্বর্ণকমল প্রুফ দেখে ও অন্যান্য ভাবে বহু সাহায্য করেছে।

'অগ্রণী'তেই সে শেষবারের সাংবাদিক রূপে কাজ করে। 'অগ্রণী
আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তবু সসম্মানে যাঁরা তাকে ডেকে নিয়েছিলে
তাঁদের কাজ সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছে। আমি মাঝখানে বেকার ছিলাম
'অগ্রণী'র কর্তৃপক্ষ ও স্বর্ণকমলের আগ্রহে মাঝে মাঝে 'অগ্রণী'তে লিখতাম
নিজের মাইনে ঠিকমতো জুটত না, তবু আমি যাতে কিছু পাই তা
জন্যে ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করতে দেখেছি। 'তাস'-এর চাকরিই তার একমাত্র
স্থায়ী চাকরি। যে সোভিয়েতকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, তারই কাজে
ব্রতী থাকতে থাকতেই তার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পেরেছে এ শুধু তার
সান্ত্বনা নয়, এ সান্ত্বনা আমাদেরও। কোনো মালিকের দাসত্ব তাকে স্বীকার
করতে হয় নি, কোথাও মাথা নিচু করতে হয় নি। স্বর্ণকমল সগর্বে এ
সগৌরবে চলে গেছে। শুধু আমাদের জন্যে রেখে গেছে তার অকালমৃত্যুর
গভীর বেদনা।

সুকুমার মি

সাহিত্যে চিকিৎসাবৃত্তি

এক

কোনো দেশের সাহিত্যে বিশেষ কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায় যদি অসামাজিক জীব হিসাবে চিত্রিত হতে থাকে, বুঝতে হবে, সমাজের মনে গুমরে-ওঠা বীতশ্রদ্ধার আক্ষেপ দেখা দিয়েছে। গ্রামের সুদখোর মহাজন, অত্যাচারী জমিদার বা জমিদারি সেরেস্তার নায়েব গোমস্তা, ধানচালের আড়তদার কিংবা কালোবাজারের মুনাফাখোর বাংলা গল্প উপন্যাসে যদি ঘৃণাই কুড়িয়ে থাকে, তার পিছনে আছে তাদের নিজেদের কৃতকর্ম।

কিছুকাল যাবৎ কিছু কিছু সাহিত্যপত্রে এমনিধারা গ্লানির রং লেগেছে চিকিৎসকের চরিত্রসৃষ্টিতে। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় চিকিৎসাব্যবস্থা এবং চিকিৎসকদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারাবাহিক যে-সব অভিযোগ এতদিন প্রকাশ পাচ্ছিল, তারই অন্য এক অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে গল্পে, উপন্যাসে, রম্যরচনায়। সূক্ষ্ম রচনাশৈলীর গুণে এগুলির প্রভাব নিঃসন্দেহে অনেক বেশি গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

ব্যাপারটা গুরুতর এই কারণে যে স্মরণাতীত কাল ধরে সর্বদেশেই চিকিৎসকরা যেন দেবত্বের অংশভাগী। সমাজজীবনে পুরোহিত যদি পেয়ে থাকেন ভক্তির আসন, চিকিৎসককে মানুষ দেখেছে সর্ববিধ মানবিক মূল্যের প্রতিভূরূপে। মানুষের সবথেকে অসহায় অবস্থায় চিকিৎসকের ভূমিকা হল জীবনদাতা ও ত্রাতা হিসাবে, বিশ্বস্ত সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে। সমাজের সর্বস্তরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সেই অকৃত্রিম এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি যদি কোনো কারণে অবিশ্বাস ও বীতরাগে রূপান্তরিত হয়ে থাকে, সকলের স্বার্থেই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার। কারণ, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যেমন জীবন-মরণের প্রশ্ন, অন্যদিকে মানব সংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম উপাদানকে কোনো কারণেই আমরা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চাই না।

দুই

প্রধানত চিকিৎসাবৃত্তিকে উপজীব্য করে দুটি লেখা আমাদের চোখে পড়েছে। দুটিই ছোট গল্প। দুটিই বিগত 'শারদীয়' সংখ্যাগুলির রচনাসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত।

একটি গল্পের নায়ক ডাঃ দস্তিদার একাধারে সার্জারি ও মেডিসিনে অসাধারণ কৃতি। প্র্যাকটিসও জমজমাট। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাকি মার্ক্সীয় দর্শনেও আকৃষ্ট; আবার গীতাও উপেক্ষা করতে পারেন না। প্র্যাকটিসের ফাঁকে ফাঁকে মার্কসীয় দর্শন ও গীতার মধ্যে "সমন্বয় খুঁজে বের করতেই হবে" থাকে, তার আসল জীবনদর্শন কিন্তু "ইয়োলো গ্লিটারিং গোল্ড।" ব্যাংকে পাশবই একখানা দুখানা তিনখানা, সিন্দুকের কোণে কোণে স্তূপীকৃত টাকা ও জড়োয়ার গহনা। ব্যবহারিক জীবনে এই তার পরমার্থ। সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য ভেদবমিতে অচেতন শিশুর অক্ষম মায়ের গা থেকে গহনা খুলে নিতে তার দ্বিধা নেই, লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছুক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর কাছে ১৬৲ টাকা ফি হাঁকতে সঙ্কোচ হয় না, আয়কর ফাঁকি দিতে ওস্তাদ আবার ধনপতি ঝুনঝুনওয়ালার সেবাদাস হতে সদাপ্রস্তুত। শেষপর্যন্ত অর্থগৃধ্নু বণিকের অনিদ্রা ব্যাধি সঞ্চয়লিপ্সু ডাক্তারকেও সংক্রমিত করার মধ্য দিয়ে গল্পের পরিণতি। একজন কৃতবিদ্য তথাকথিত সমাজসেবী ডাক্তারের সমাজ বা জনসেবার কোনো ইচ্ছা বা সক্রিয় প্রচেষ্টার, এমনকি কোনো মানসিক দ্বন্দ্বেরও কোনো পরিচয় এ-গল্পে পাওয়া গেল না। ফুটে উঠেছে শুধু এক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর নির্লজ্জ লোভাতুর চরিত্র। এ-গল্প পড়ার পর পাঠকের মনে চিকিৎসাবৃত্তি সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে।

অপর গল্পটির প্লট হচ্ছে একজন চোখের ডাক্তার ও এক দাঁতের ডাক্তারের মধ্যে কূট ব্যবসাগত সম্পর্ক। চড়া দরে চশমা ও দাঁত বিক্রি করেই ক্ষান্ত নয় তারা, বখরাদারি ব্যবসার কৌশল হিসাবে মিথ্যা মৃত্যুভয় দেখিয়ে একে অপরের কাছে রোগী পাঠায়। গল্পের শেষে নিজের জবানীতে লেখক সিদ্ধান্ত টেনেছেন, "দু-মুড়োয় দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুই দোস্ত র‍্যাকেট হাতে নিয়ে। মাঝখানে রয়েছি বেকুব জনসাধারণ আমরা, আর ক্রমাগত ঘা খেয়ে এক হাত থেকে অন্য হাতে চলাফেরা করছি টেনিস বলের মতো। দিচ্ছি তার জন্য জবর আক্কেলসেলামি।" অতি সরল এবং স্থূল বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রচিত। কোনো কল্পিত চরিত্র নয়, "জনসাধারণ" শিকার হয়েছে দুই ঝানু ব্যবসাদারের—যাদের পেশা চিকিৎসার নামে লোক ঠকানো। গল্পের নাম তাই 'মাসতুতো'।

তিন

বাস্তবধর্মী সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হতেই পারে। কিন্তু উল্লিখিত গল্প দুটির রচয়িতাদের উদ্দেশ্যটা কি? যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই রকম ভ্রষ্ট-চরিত্র কোনো ডাক্তারের সংস্পর্শে আসার দুর্ভাগ্য তাঁদের হয়েছে, তবু একথা তো সত্য যে অসাধু লোক সব বৃত্তিতেই দু-চার জন থাকতেই পারে। 'ইয়োলো জার্নালিজম' কথাটা হওয়ায় ভেসে আসে নি। তাই বলে বিচ্ছিন্ন কোনো দুষ্কৃতিকে বিশেষ কোনো পেশার বৈশিষ্ট্য হিসাবে এমনভাবে চিত্রিত কেউ করে না যাতে সেই পেশা সম্পর্কে পাঠকের মনে বিদ্বেষ বা সন্দেহের অবকাশ ঘটে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে কোনো সামাজিক দুর্লক্ষণ আপাতত ক্ষীণ বা অস্পষ্ট বলে ব্যাধিটা মহামারীরূপে প্রকট না হওয়া পর্যন্ত সে-সম্পর্কে নীরব বা নিশ্চেষ্ট থাকতে হবে। না, তা নয়। দুর্নীতির তীক্ষ্ণতম সমালোচনা হোক। কিন্তু কোনো সামাজিক চিত্র আঁকার সময় সৎ অসৎ সবরকম চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ পটভূমিকায় তুলনামূলক বিচারের সুযোগ থাকা উচিত। সঞ্চয়ের পাপ নেশা যদি কোনো কদাচারীর রাতের ঘুম কেড়ে নেয় তো নিক। কিন্তু তারই পাশাপাশি শোষিত শ্রেণীর অংশীদার যারা জীবনযুদ্ধে একইভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সেবাব্রতের ঐতিহ্যে আজও কায়ক্লেশে অবিচল আছে, তাদের কথাও যদি না থাকে, শুধু মসীলিপ্ত ছবিটি অসম্পূর্ণ হয় নাকি? বহু বিতর্কমূলক বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ইতিবাচক প্রচেষ্টা হয়েছে বনফুলের 'হাটেবাজারে' উপন্যাসে—মানবপ্রেমিক উদারহৃদয় ও দৃঢ়চেতা ভুজঙ্গ ডাক্তারের আদর্শ চরিত্র সামনে রেখে প্রাইভেট প্র্যাকটিশের অশুভ লক্ষণগুলির সমালোচনা করে।

বিচার আর এক দিক থেকেও হতে পারে। কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবিশেষের মননক্রিয়ার অনুশীলনে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় একই সাথে আলো-ছায়ার দ্যোতনা—একই মানুষের ভালো মন্দ দুই দিক। কোথাও মহত্ত্ব অতিক্রম করে যায় সকল হীনতাকে, কোথাও বা ক্ষুদ্রতা ও অপরাধ-প্রবণতারই প্রাধান্য; আবার কোনো ক্ষেত্রে হয়তো সুমতি-কুমতির মধ্যে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের স্ফুলিঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত করে চলে সম্পূর্ণ মানুষটিকে। সেই সামগ্রিক ছবি বুঝতে সাহায্য করে কোন সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে মানুষটার পদস্খলন হল, কিসেই বা তার মুক্তি। এমনি এক আকর্ষণীয় চিত্র আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে।

এখানেও নায়ক একজন পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার যে তার বৃত্তির মহত্ত্বকে কর্ণি করেছে। দারোগার বন্ধুত্বে ভর করে পরস্পরের মধ্যস্থতায় দুজনেরই যে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল তাকে কোনোক্রমেই সৎপথ বলা চলে না। কি দেখা গেল আদরিণী একমাত্র কন্যার আকস্মিক মৃত্যুতে কঠিন 'ল ডাক্তারের আত্মশুদ্ধিতে সাহায্য করেছে। শুরু হয়ে যায় তীব্র মানসি দ্বন্দ্ব, অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত। পরিণতি, "শেষ পর্যন্ত ভিটা ছাড়িতে হইল।" একথা মনে রাখা দরকার যে সে-যুগের স্বনামধন্য ও মহানুভব অনে ডাক্তারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় ও সখ্যতা ছিল। তা সত্ত্বে তাঁদেরই পেশাভুক্ত কেউ কেউ মানবতার সুমহান ঐতিহ্য পরিত্যাগ কর নিছক বৈশ্যবৃত্তি ও অনাচারে আসক্ত হচ্ছেন, এ ইঙ্গিত না দিয়ে তিনি পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে এও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই গল্পে স্বধর্মচ্যুত ডাক্তারের সমস্ত অতীত অপরাধ ছাপিয়ে উঠেছে তার প্রায়শ্চিত্ত প্রচেষ্টা—উৎপীড়িত এক কৃষকের স্বপক্ষে ঘুষখোর দারোগার অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ। হীনতাকে জয় করে মনুষ্যত্ববোধের শুচিস্নানে এ যে মুক্তি, সেই পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গির গুণে পাঠকের মন উৎপীড়িতের প্রতি সমবেদনায় এবং চিরন্তন মানবধর্মের প্রতি নতুন আস্থায় ভরে ওঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে 'ঘুম' ও 'মাসতুতো' গল্পে অম্লতার ঝাঁঝ থাকলেও সদগুণে সৌরভ নেই।

চার

কথা উঠেছে ডাক্তারদের নীতি-নিষ্ঠার অভাব নিয়ে, নিঃস্বার্থ সেবাপরায় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি সম্পর্কে। অভিযোগের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি বিস্তার করে লাভ নেই এই কারণে যে অধিকাংশ ধনতান্ত্রি দেশের মতো ভারতীয় সমাজব্যবস্থাতেও চিকিৎসাকে পণ্য এবং চিকিৎসকে ব্যবসায়ী হতে বাধ্য করা হয়েছে। পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য অনুসরণ করা এথিক্‌স্‌-এর অনুশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এই বৃত্তির মহত্ত্বের একটি অন লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে নিজ দেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক নিয়মাবলীর প্রভাব মুক্ত হওয়া তো সম্ভব নয়। ঘট হচ্ছে এই যে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসা চিকিৎসা ক্রয় করতে হয়, এবং অধিকাংশ চিকিৎসককে সম্পূর্ণ নিজ দায়ি

জীবিকা অর্জন করতে হয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিক্রয় করে। রাষ্ট্র তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো দায়িত্ব নেয় না; সমাজ তাদের কাছে যে নীতিধর্ম প্রত্যাশা করে, তার উপযোগী পরিবেশ ও উপাদান সৃষ্টি করতে অক্ষম। সেই মূঢ় অবহেলা ও মুখর প্রত্যাশা, সেই পাণ্ডুর নীতিধর্ম ও পৌরাণিক অনুশাসনের সঙ্গে রূঢ় জৈবিক প্রয়োজনের হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতির মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর যা কিছু দোষগুণ নিয়েই প্রাইভেট প্র্যাকটিস চলছে রাষ্ট্র ও সমাজের মৌন সম্মতিক্রমে। হিউম্যানিজম-এর এথিকস শাশ্বত এবং চির-উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও ক্ষয়িষ্ণু সমাজদেহে তার রূপটি খর্বিত ও বিবর্ণ। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, অসুস্থ মানুষকে ঘিরে পরিজন ও পড়শীরা যখন উদ্বেগে আকুল, প্র্যাকটিশানারকে ছুটে আসতে হয় শুধু মানবিক আহ্বানে নয়, জীবিকার দায়ে পারিশ্রমিকের প্রত্যাশায়। বহু ক্ষেত্রে সে-প্রত্যাশা পূরণ হয় না, এও সত্য। মহৎ বৃত্তির এই গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব আজও সাহিত্যে ভাষা পায় নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যাঁরা চাকরি করেন তাঁদের মধ্যে নীতিভ্রষ্টতা দেখা যাচ্ছে কেন? চাকুরীজীবি বলতে এক্ষেত্রে আমরা বুঝি প্রধানত হাসপাতাল কর্মীদের। বস্তুতপক্ষে সংবাদপত্রে ডাক্তারদের বিরূপ সমালোচনা হয়ে থাকে অধিকাংশই হাসপাতালের পটভূমিকায়। সৌজন্যহীনতা, কর্মবিমুখতা বা যান্ত্রিক মনোভাব সম্পর্কিত এই সব অভিযোগের কতটুকু সত্য, কতটা ব্যক্তিগত এবং কতটা নিছক প্রশাসনিক বিচ্যুতি প্রসূত, বার বার দাবি করা সত্ত্বেও সে বিচার আজও হয় নি। হয় নি বলেই হতাশার জলাভূমিতে গজিয়ে ওঠে অরাজকতার জঙ্গল। যার ছেলেটি সাপের কামড়ে বা ভেদবমিতে ঢলে পড়েছে তার পক্ষে অস্থির ও আবেগকাতর হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে স্কুল-কলেজ কারখানার মতো হাসপাতাল ও হেল্‌থ সেন্টারগুলিও যে আধুনিক সমাজজীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে, শীর্ষে এই বোধ জাগ্রত হয় নি বলেই দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক পটভূমিতে হাসপাতালের প্রকৃত ভূমিকা কি হবে কোনো স্তরেই সে ধারণাও স্বচ্ছ হচ্ছে না। তারই জন্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মহামিলন কেন্দ্রে জরা ও মরণজয়ের তপস্যা এবং আর্তসেবার মানসিক আবেদন চলেছে প্রায় সমান্তরালে।

পাঁচ

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে একথা প্রায় সর্ববাদীসম্মত যে চিকিৎসকের প্রজ্ঞা ও দক্ষতাকে সমাজকল্যাণে সার্থক ব্যবহারের প্রাথমিক এবং আবশ্যিক শর্ত হল সমগ্র চিকিৎসাব্যবস্থার উপর সামাজিক কর্তৃত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। প্রতিদিনের আত্মপীড়ন ও ক্ষুদ্রতা থেকে চিকিৎসকের মুক্তিও এই পথে। ক্রেতার সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল পণ্যমূল্যে বিক্রিত বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তির অবাধ বিকাশ যে কিছুতেই সম্ভব নয়, গত একশ বছরের ইতিহাস তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত করাতেই নীতিধর্ম কিংবা মানবিক মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় না, তাও সত্য। সমাজের শোণিত-স্রোত দুর্নীতির বীজাণু দূষিত হলে বিশেষ একটি প্রত্যঙ্গকে দীর্ঘকাল সুস্থ ও সক্রিয় রাখা দুরূহ।

আসলে সমস্যা গভীর : তার শিকড়ও অসংখ্য এবং বহুবিস্তৃত। আফিস-টাইমে ট্রামে-বাসে প্রচণ্ড ভিড়ে পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে আমরা বিরক্ত হতে পারি ; কিন্তু পিছনের লোকটি যে তার পিছন থেকেও ঠেলা খাচ্ছে, এই দৃষ্টিশক্তি না থাকলে আমাদের পারস্পরিক ধৈর্যচ্যুতির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে ভিড়ের জন্য দায়ী সুচতুর মূল আসামীটি। নীতি হিসাবে একথা মানতেই হবে যে কোনো ব্যাধি নিরাময় বা প্রতিষেধ করতে হলে চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অপরিহার্য। সমালোচনাও সহযোগিতার অঙ্গ। তার তীক্ষ্নতা নিয়ে ততটা উদ্বেগ নেই যদি গল্পে উপন্যাসে ব্যঙ্গ বা সংবাদ-সাহিত্যে সেই সমালোচনা হয় বাস্তবধর্মী ও গঠনমূলক।

সমর রায়চৌধুরী

ষড়বিংশ প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্বসম্মেলন

নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্বসম্মেলন নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। ইউরোপের বাইরে, ইস্তাম্বুলে আহূত সম্মেলনটি বাদ দিলে বলা চলে, প্রাচ্যদেশে, প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্বসম্মেলন এই প্রথমবার আহূত হলো। মস্কোতে, পঞ্চবিংশ অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন পরবর্তী সম্মেলন ক্ষেত্র হিসাবে নয়াদিল্লীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন তখন সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনির দ্বারা সে প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। নয়াদিল্লী অধিবেশন প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনকারী পণ্ডিতদের মধ্যে কতখানি আগ্রহের সঞ্চার করেছিল, তা, অতএব, সহজেই অনুমেয়। অর্ধশতাধিক দেশ থেকে কিঞ্চিদধিক তেরোশো প্রতিনিধি নয়াদিল্লীতে সমবেত হয়েছিলেন। প্রতিনিধিদের এই সংখ্যা পূর্ববর্তী সকল সম্মেলনের তুলনায় অকল্পনীয়। বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন ছয় শতাধিক। এবং ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীর বিপুল সংখ্যায় এই মহতী সমাবেশে যোগদানও কম তাৎপর্যমণ্ডিত নয়। সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি।

প্রতিনিধিদের অকৃত্রিম আগ্রহ ও মনোনিবেশের ফলে সপ্তাহব্যাপী এই বিশ্বসম্মেলনটি যথার্থ জ্ঞানসত্রে পরিণত হয়েছিল। জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে প্রতিনিধিদের মনখোলা আলোচনা, প্রশ্ন, বিতর্ক এবং পরস্পরিক সৌহার্দ্য নয়াদিল্লী অধিবেশনের তাৎপর্যকে গভীরতর করেছিল। ধর্মের বা রাজনীতির গোঁড়ামীর ঊর্ধ্বে সংস্কারমুক্ত অনুসন্ধিৎসু মননশীলতাই সবদিক থেকে বড় হয়ে উঠেছিল। সম্মেলনে যোগদানকারী একজন প্রতিনিধি হিসাবে এই ধারণা নিয়েই নয়াদিল্লী থেকে ফিরে এসেছি। সাতদিন ধরে দেশের ও বিদেশের বহু প্রতিনিধির সঙ্গে মেলামেশা ও আলোচনা করার যে সুযোগ পেয়েছি তা থেকেই আমার মনে এ ধারণাগুলি গড়ে উঠেছে।

অবশ্য, একথা স্বীকার করতেই হবে যে অসাধারণ বা অশ্রুতপূর্ব কোন নতুন তথ্য বা তত্ত্ব এই সম্মেলনের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসেনি। রোমাঞ্চকর কোন নতুন আবিষ্কারের কথাও শোনা যায়নি।

৪ঠা জানুয়ারী বেলা দশটায় বিজ্ঞানভবনের মূল সভাগৃহে সম্মেলনের উদ্বোধন হল বিস্‌মিল্লা খানের সানাই বাজনা দিয়ে। বর্ষীয়ান ভারত-বিদ্যা-গবেষক ডঃ পি. ভি. কানে আহ্বায়ক সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানালেন। তারপর বিদায়ী সভাপতি বি. গফুরফ ভাষণ দিলেন। সম্মেলনের সভাপতি হুমায়ুন কবীরের ভাষণের পর ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বাগত বাণীটি পাঠ করে শোনানো হলো। পাঠ করে শোনানো হলো রাষ্ট্র সংঘের সম্পাদকের শুভেচ্ছা বাণী এবং ইউনেস্কোর ডিরেক্টার জেনারেলের তারবার্তা। সন্ধ্যা ছয়টার সময় শ্রীনেহেরু এলেন প্রতিনিধিদের কাছে কয়েকটি বক্তব্য উপস্থিত করবার জন্য। ৫ই জানুয়ারী থেকে সম্মেলন দশটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনায় ব্যাপৃত হলো।

মিশরীয় পুরাতত্ব, সেমীয় বিদ্যা (ব্যাবিলনয়ীয় ও হিব্রু), হিত্তীয় ও ককেশীয় বিদ্যা, আলতাই ও তুর্কবিদ্যা, ইরানীয় বিদ্যা, ভারতবিদ্যা (বেদ ও সিন্ধু সভ্যতা, ক্লাসিকাল সংস্কৃত, দর্শন ও ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আধুনিক ভারতীয় ভাষাতত্ব), দক্ষিণপূর্ব এশীয় বিদ্যা, পূর্ব এশীয় বিদ্যা, ইসলামী তত্ত্ব, আফ্রিকান বিদ্যা—এই দশটি বিভাগে প্রতিদিন যে সব প্রবন্ধ পড়া হয়েছে, যে সব আলোচনা হয়েছে তার এমনকি তালিকাটি পর্যন্ত গ্রন্থাকৃতি। অতএব সে সম্বন্ধে দু-চার কথায় কিছু না বলাই সঙ্গত মনে করি। উল্লেখযোগ্য দুটি সাধারণ আলোচনার বিষয় ছিল 'মানববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদ্যার ভূমিকা' ও 'মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন'। প্রথমটিতে অধ্যাপক সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ফিলিয়োজা, অধ্যাপক ব্যাশাম এবং অধ্যাপক নর্মান ব্রাউন ও ডঃ পালাত্ অংশগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়টিতে যোগ দিয়েছিলেন—মৌলানা সয়ীদ আহ্‌মদ আকবরাবাদী, তুরস্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত সৈফুল্লা এসিন, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মাননীয় রাষ্ট্রদূত আহ্‌মদ হাসান এল ফেকি, অধ্যাপক অ্যাণ্ডারসন ও অধ্যাপক নাসর্।

সম্মেলনের শেষ অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় এবং নানা ছোট জটলায় একটি কথাই বার বার শোনা গেল—আবার দেখা হবে। আমেরিকায় ১৯৬৭ সালে সপ্তবিংশ প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। ততদিন প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগী গবেষকগণ আপন আপন প্রতিষ্ঠানে নিমগ্ন হয়ে থাকবেন নিরলস জ্ঞানান্বেষণে। বিশ্বসম্মেলন জ্ঞানের আদানপ্রদান ও মনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে বারে বারে এই ভাবেই নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে দেয়।

অনিমেষ পাল



পরিচয়